বিয়ের পরে

শ্রীমতী আশালতা সিংহ

শ্রীযুক্ত খগেশচন্দ্র দত্ত

ও

শ্রীমতী লক্ষ্মী দেবীকে

তাঁহাদের অকৃত্রিম বন্ধুত্বের নিদর্শন-স্বরূপ

একান্ত প্রীতি ও শুভকামনার সহিত

এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি

অর্পিত হইল।

বিনীতা—আশালতা সিংহ

ভাগলপুর
২৪শে ফাল্গুন, ১৩৪২

বিয়ের পরে

উপন্যাসের অঙ্গরাগ

কথা—শ্রীআশালতা সিংহ

নাম—শ্রীব্রজমোহন দাশ

রেখা—শ্রীপূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

স্থান—কমলিনী-সাহিত্য-মন্দির

বিয়ের পরে

—উপন্যাস—

শ্রীআশালতা সিংহ

লীনার প্রাণের বন্ধু সরমা। দু'জনেই এককলেজে এক শ্রেণীতে পড়ে। সেদিন ঘণ্টা-দুই ক্লাস হওয়ার পরেই অনেকটা ছুটি পাওয়া গেল। ক্রমক্রমে প্রথমবার্ষিক-শ্রেণীর মেয়েরা আসিয়া জমা হইল। নিজের নিজের রুচি এবং খেয়াল খুসীমত এক এক দল যথেচ্ছা গল্প করিতে সুরু করিল। একটি মেয়ে নির্জ্জন শরৎ-রৌদ্রে সমস্ত ভীড় এড়াইয়া চুপ করিয়া একটা গাছের তলায় বসিয়াছিল। কলেজের কম্পাউণ্ডের ছাঁটা-ঘাসের উপর শরতের সোণালি-রৌদ্র পড়িয়া ঝক্ ঝক্ করিতেছে। সুনীল আকাশে একটা আতপ্ত স্বচ্ছতা। লীনা সরমার কাণে কাণে চুপি চুপি কহিল, "ঐ দেখ, বিজয়া বসে রয়েচে একা আপন মনে। ওর ঐ কবিপনা আমি দু'চক্ষে দেখতে পারিনে। সদাই এমন একটা ভাব ঠিক্‌রে পড়চে ওর চারিদিক হতে যেন সমস্ত পৃথিবীতে ও একলা। কারো সঙ্গেই ও মিশতে পারেনা, গোটা জগতে ও যেন নিজের মিশবার যোগ্য লোক খুঁজে পেলেনা।"

সরমা হাসিয়া বলিল, "আমি কিন্তু জানতে পেরেচি, একজনের সঙ্গে ও এত বেশি মিশেচে যে তারপরে আর ওর কিছুই ভালো লাগচেনা। কলেজে আসতে হয় আসচে, দিনগুলো চোখের সুমুখে ছায়াবাজীর মত কেটে যাচ্ছে, ও গাছের ছায়ায় আনমনে বসে বসে শুধু তাই দেখচে।"

"কেন, কেন, কী হয়েচেরে? নিশ্চয় আশ্চর্য্য একটা কিছু!"

"আশ্চর্য্যও বলতে পার, আবার তা না বলতেও পার। কেননা সব মেয়েদেরই জীবনে তো অমনি একদিন আসে। অমনি চুপ করে অন্তমনস্ক হয়ে চেয়ে থাকবার দিন—কেবলই বসে বসে একজনকে ধ্যান করবার দিন। কেন তুই জানিসনে, সরজিৎসেন এবারে বি-এস-সিতে যে ফাষ্ট ক্লাস ফাষ্ট হয়েচে তার কথা? বিজয়ার সঙ্গে যে তার বিশেষ রকম আলাপ হয়েচে।"

"তাই না কি? এতদুর? কেমন করে কখন হোল? তা হওয়া কিছুই বিচিত্র নয়। বিজয়ার বাবা একেবারে আপ্-টু-ডেট্। ভয়ানক লিবারেল্। সেদিন একটা পার্টিতে আমরা ওদের বাড়ী গিয়েছিলেম। বাব্বাঃ, যা সব কাণ্ড কারখানা! সব একেবারে খাঁটি ইউরোপীয়ান্ ষ্টাইল। আচ্ছা, সরজিৎসেন না ঐবে কি বল্লি, তারা নিশ্চয় খুব বড়লোক। নইলে কিছু আর বিজয়াদের ওখানে কল্কে পেতে হয়না। বিজয়ার

যাকে আমি জানিতো……ভদ্রমহিলা টাকাকে যেন পুজো করেন!"

"কিন্তু বিজয়া ওর মা'র মত হয়নি, এটুকু আমি বেশ জানি। বিজয়ার স্বভাবের ভারি মধুর একটি আকর্ষণ রয়েচে। এই যে রোজ এত বড় একটা মিনার্ভা-কারে করে কলেজে আসে, ক'টা মেয়ে অমন আসে। কিন্তু ওর কাছে দুদণ্ড ব'সলে মনেও হয়না যে ওদের খুব টাকা রয়েচে। কথাবার্ত্তায় ঝাঁঝ্ নেই কিছুই।"

"টাকার ঝাঁঝ?"

"ঠিক তাই। বাবা, দেখিসনে কৃষ্ণাকে! রাতদিন মুখে বোলচাল লেগেই রয়েচে। ওর দাদার মোজা প্যারিস থেকে ইস্ত্রি হয়ে আসে, ওর বৌদি কেম্ব্রিজে পড়েছিল। ওদের বাড়ী সবশুদ্ধ্ সতেরটা ঘড়ি।"

"আচ্ছা থাক পরের আলোচনা। আমার কিন্তু ভারি মজা লাগছে, বিজয়ার মত মেয়েও শেষকালে……আমি এককালে ভাবতেম, ওদের মত মেয়েরা কেবল পড়ে শুনে পরীক্ষার স্কলারশীপ্ পাওয়া ছাড়া আর কিছুই করতে পারেনা।"

"এর মধ্যে আর আশ্চর্য্য কী দেখতে পেলি, সেই কবিতাটা রবীন্দ্রনাথের—তোর মনে নেই? 'প্রেমের ফাঁদ পাতা ভুবনে,… কে কখন ধরা পড়ে কে জানে……"

"আচ্ছা থাক ও আলোচনা, ঐ শোন ঘণ্টা পড়চে।

ছিট্রির ক্লাসটা যা খারাপ লাগে, মনে হয় যেন কতক্ষণে শেষ হবে।

*

* *

বিজয়াদের বাড়ীতে তখন সন্ধ্যা হয়-হয়। ঘরে ঘরে বিদ্যুতের আলো সবেমাত্র জলিয়া উঠিয়াছে, টেনিসকোর্টে চারজনে খেলিতেছে, বেঞ্চে কয়েকজন বসিয়া আছে। বাগানের নানা দেশী ও বিলাতী ফুলের মৃদু ও মিশ্রিত সৌরভ আসিতেছে। বিজয়ার পড়িবার ঘর শূন্য। ঘর দীপহীন। ধীরে কে একজন ঢুকিল। আলো না জ্বালিয়া বাগানের দিকের জানালার কাছে দাঁড়াইল। একটু পরে নিঃশ্বাস ফেলিয়া সরিয়া আসিল, সুইচ টিপিয়া আলোটা জ্বালিল। টেবিলের কাছে আসিয়া দুই হাতে মাথা রাখিয়া বসিয়া রহিল। ঘরে মৃদু নিঃশব্দ পদসঞ্চারে আর একজন আসিল। টেবিলের কাছে হাতের মাঝে মাথা রাখিয়া যে ছিল তাহার ললাট স্পর্শ করিল। সরজিৎ একটুখানি চমকিয়া কহিল, "কে, বিজয়া তুমি! বোস, তোমার সঙ্গে আমার কয়েকটা কথা আছে আজ।"

বিজয়া মুখ টিপিয়া হাসিয়া কহিল, "কথা তো ব'লবেই। কিন্তু কথা ব'লবার রীতি কি ঐ রকম? দেখনা, আমি তোমাকে

দেখতে পাব বলে একটা বাজে ওজর করে টেনিসের হল্লা থেকে পালিয়ে এসেচি।"

"বোস বিজয়া।"

"ভ্যাখো, মনে রেখো এটা তোমার ক্লাসরুম নয়। এখানে তুমি লেক্‌চারার নিযুক্ত হওনি। যেখানে হয়েচ সেটা সিটিকলেজ। বিজয়ার বসবার ঘর নয়।"

"সেই কথাই তোমাকে বোলব মনে করেচি।"

"তার মানে?"

"ভ্যাখো বিজয়া, আমি রোমান্টিক-টাইপের নই। আমার মনের গড়ন অন্যরকম। মনে কোরোনা তা বলে যে, আমি রাত জেগে ক্রমাগত পরীক্ষার পড়া মুখস্থ করে করে আগাগোড়া নোটবইয়ের মত নীরস হয়ে গেছি। কিন্তু ও কথা থাক, আমি যা জিজ্ঞেস করতে চাইছি সেটা হচ্চে এই যে, সত্যিই কি জীবনে আমাকে তোমার কোন প্রয়োজন আছে? আগেই বলেচি আমি রোমান্টিক নই। জীবনে যার দরকার নাই তাকেই রঙীন রঙ ফলিয়ে অতি প্রয়োজনীয় করে তুলতে পারব না। অতএব আজ স্পষ্ট করে শুনতে চাই। আমাকে কি তোমার দরকার আছে?"

"যদি বলি আছে।"

"তাহলে তোমাকে আরও গুটিকতক অবশ্যজ্ঞাতব্য তথ্য শোনাব। তারপরে চাইব তোমার মতামত।

তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে হয় তিনি আদৌ চাননা। তিনি এমনতরো সম্ভাবনা কল্পনা করতেও পারেননা।"

"তুমি পারো?"

"দাঁড়াও, যে কথা বলচি, আগে শেষ করে বলে নিই। কিন্তু বাবার মত অন্যরকম। তিনি বললেন মা'কে, সুরো, বিলেতফেরত বেশিবয়সী দিক্‌পাল ব্যারিষ্টার কিংবা সিভিলিয়ান জামাই করতে চাও কর, কিন্তু ওতে রস নেই, মাধুর্য্য নেই। ও অনেক দেখেচি, অনেক শিখেচি। যেখানে সহজে, মনের অবারিত মাধুর্য্য একটা জিনিষ একটু একটু করে গড়ে উঠেচে তাকে ভেঙ্গে দিয়োনা।"

"তোমার বাবা খুব উদার দেখচি।"

"নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে বলচেন।"

"আর তোমার মা?"

"তিনিও বলচেন নিজের জীবনের সঞ্চিত পুঁজি থেকে।"

"দু'জনে একসঙ্গে জীবন আরম্ভ করলেন আর দু'জনের দু-রকম অভিজ্ঞতা। একযাত্রায় পৃথক ফল!"

"আমি সেটা আবিষ্কার করেচি।"

"কি আবিষ্কার করেচ? কেমন করে?"

"এই ক'দিন বাবার পুরোণ লাইব্রেরী গুছিয়ে রাখছিলেম, বইগুলো ঝেড়ে রোদে দিয়ে। তার ভিতর থেকে একটা বহুদিন

আগের হলদে-হয়ে-যাওয়া-পাতা পুরোণ খাতা আবিষ্কার করলেম। বাবার প্রথম জীবনের ডায়েরি।"

"গল্পটা ব'লনা শুনি। যেসব অত্যন্ত পরিচিত লোকদের অহর্নিশি চার পাশে দেখতে পাই, তাদেরও আর একটা রূপ আছে, আমাদের নিত্য পরিচয়ের অন্তরালে। জানতে ভারি কৌতূহল হয়।"

"গল্পটা তোমাকে বলচি সংক্ষেপে। কিন্তু সেইদিন থেকেই আমাকে ভাবিয়ে তুলেচে।"

"আচ্ছা, আগে গল্পটা শুনি।"

"ধর, পঁচিশ বছর আগে, আজ যেমন এই নির্জ্জন-সন্ধ্যায় তুমি আর আমি পাশাপাশি বসেচি, এমনি এক সন্ধ্যায় একটি ছেলে আর মেয়ে ব'সেছিল। তারা পরস্পরকে ভালোবাসত। ঠিক যেমন আমি তোমাকে ভালোবাসি।—"

বিজয়া একটু চুপ করিল। কি যেন ভাবিতে লাগিল।

সরজিৎ মনে মনে কহিল, তুমি মেয়েমানুষ বলেই অমন কথা বলতে পারলে। 'আমি যেমন তোমাকে ভালোবাসি।' পুরুষ হলে অমন কথা বলতে পারতেনা প্রিয়তমে। পৃথিবীতে আমরা যত সামান্য মানুষই হইনা কেন আমাদের প্রেম অনন্যসাধারণ। তা সব মানুষের চেয়ে অন্যরকম। প্রত্যেকের থেকে স্বতন্ত্র। অন্ততঃ এইটুকু গর্ব্ব পুরুষের না থাকলে সে বাঁচতো কী নিয়ে!

বিজয়া বলিতে লাগিল, "কিন্তু ছেলেটি সামান্য অবস্থার।

পড়াশোনায় ভালো। 'ল'-কলেজে ঢুকেচে। টিউসনি করে, দেশের বাড়ী বন্ধক রেখে কিছু টাকার জোগাড় করেচে। ইচ্ছা, সেইটা জমা দিয়ে এটর্ণী-লাইনে ভর্ত্তি হয়। মেয়েটির অল্প বয়স, মনে আছে আদর্শবাদের ঢেউ, প্রেমকে নিয়ে আকাশকুসুম ভাঙা আর গড়া। সে নিজের মনের জোর সম্বল করে ঐ ছেলেটিকে বিয়ে করলে।"

"বড্ড পুরোণ গল্প বিজয়া, মান্ধাতার আমলের। এক সুন্দরী রাজকন্যার সঙ্গে এক গরীব কাঠুরিয়ার বিয়ে হোল। সেই যে ছোটবেলায় উপকথায় পড়েছিলেম—"

"জগতের কোন গল্প—পুরাতন নয় বলো? গল্পটা পুরোণ, কিন্তু গল্পের থেকে যে সত্য আবিষ্কার করলেম, আমার পক্ষে সেইটেই নতুন। তারপরে শোন, সেই ছেলেটির সঙ্গে মেয়েটির বিয়ে হোল। ছেলেটি নব উৎসাহে লাগ্‌লো জীবন-সংগ্রামে। তাকে কত অন্ধকার, কত অবমাননা, কত ক্ষতবিক্ষত আত্ম-সংগ্রামের মধ্য দিয়ে পার হয়ে আসতে হো'ল। তবু সমস্ত ক্লেশের ভিতরে ভিতরে তার একটি আনন্দের সুর বাজতে লাগ্‌লো, তার প্রেয়সী নারী এই জীবন-সংগ্রামে তার পাশে এসে দাঁড়িয়েচে। সে সকলকে ছেড়েচে কেবল তারই পাশে এসে দাঁড়াবার জন্যে। এই তীব্র আনন্দ মদিরার মত তার সমস্ত প্রচেষ্টাকে উত্তেজিত, সঞ্জীবিত করে তুললো। কিন্তু প্রেয়সী নারী তখন কী করছিলো? তুমি বলতে পারো?"

সরজিৎ বলিল, "পারি বইকি। সে'ও একটা আদর্শবাদের কড়া মদে নিজের দুঃখ কষ্ট সমস্তই ভুলে থাকত।"

"হোলনা। তোমার আন্দাজ ঠিক হোলনা। যে মুহূর্ত্তে বিদ্যুৎদীপ-উদ্ভাসিত সুসজ্জিত প্রাসাদ ছেড়ে স্যাঁৎসেতে অন্ধকার একতলা এক ঘরে তার জীবনের রঙ্গমঞ্চের পট-ভূমিকা উঠ্‌লো, সেই থেকেই তার আদর্শবাদ ফিকে হয়ে আসতে লাগ্‌লো। সে নিজেকে নিজে হাজারবার ঘুরে ফিরে প্রশ্ন করতে লাগ্‌লো, 'কেন তোমার এমনতরো পাগ্‌লামি হয়েছিলো, জীবনের আরাম সুখ স্বাচ্ছন্দ্য সবই অতল জলে বিসর্জ্জন দিতে হোল। যা গেল তা আর কোনদিন ফিরে পাবো না।' এক একবার তার মনে হোত, হয়তো আবার ফিরে পেতে পারি। যখন আমার স্বামী জীবন-যুদ্ধে জয়ী হয়ে আমার কাছে আসবেন, তখন ধন হবে, তখন আবার ফিরে আসবে সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য। কিন্তু সে কবে? সে কখন? তার আগে আরো কত সহ্য করতে হবে। তার মনের এই হতাশা এই শোক এই অবসাদ কিন্তু তার স্বামীর কাছে ধরা পড়লো না। সে তখন আকণ্ঠ ডুবে রয়েচে কর্ম্ম-স্রোতের বন্যায়। এক মিনিট তার অবসর নেই, এক দণ্ড তার ফিরে তাকাবার যো নেই। সে নিজের মনের ধারণা নিয়েই খুসী, তাই নিয়েই সে কাজ করে চলেছে, যে আমাকে ভালোবাসে সে আমার পাশে রয়েচে, আমার মধ্যেই রয়েচে সে। আমার উদ্দেশ্য আর আমার আদর্শ তার থেকে অভিন্ন। তারপরে যখন

সে উঠতে আরম্ভ করলো, অর্থের সঙ্গে সঙ্গে অবকাশ, স্বাচ্ছন্দ্য, আরাম সমস্তই ভীড় করে এসে দাঁড়ালো, তখন চমকে ফিরে দেখলে তার স্ত্রী তো নেই! সে তো কখন কর্ম্মহীন ধনী সম্প্রদায়ের অজস্র সৌখীন মেয়েদের ভীড়ে হারিয়ে গেছে। সে কোথায়? প্রথম জীবনে একদিন যাকে পাশে পেয়েচে, যাকে পাশে পাওয়ার উন্মাদনায় সে অসাধ্য-সাধন করেচে। বুঝতে পারলে আর তাকে ফিরে পাবেনা।”—বিজয়া কিছুক্ষণের জন্য চুপ করিয়া রহিল। সরজিৎ মৃদুকণ্ঠে কহিল,—“তারপরে?”

“তারপরে খুবই সাধারণ। মেয়েটি ক্রমশঃ যৌবন-সীমা পার হয়ে প্রৌঢ়া হয়ে এ’ল। আজ এ-সমিতির চাঁদা, কাল বন্যা-সমিতির রিলিফ ফাণ্ড্ পরশু তরফদারের পার্টি এই সব নিয়ে ব্যস্ত-দিন যাপন করতে লাগ্‌লো। তার স্বামী নিজের ব্যবসায়, ক্লাব, বন্ধু, সিনেমা তাই দিয়ে দিনগুলোকে ভরিয়ে তুললেন। সময় কেটে যেতে লাগ্‌লো।—”

সরজিৎ সোজা হইয়া বসিয়া কহিল, “গল্পটা পুরোণ লাগ্‌লো আগেই বলেছিলেম। তারপরে সত্য কি আবিষ্কার হ’লো, সেইটে মনে হচ্চে যেন এইবারে বুঝবার কিনারায় এসেচি। তোমার বাবা নিজের বঞ্চিত জীবনের ক্ষোভ থেকে বলচেন, টাকা পয়সায় সুখ নেই। একদিন ঐ বস্তুকেই ধ্যান জ্ঞান করে ছুটেচি। যখন করায়ত্ত হোলো, তখন দেখতে পাওয়া গেল, যা ভাবা গিয়েছিলো তা নয়। আর তোমার মা প্রথম জীবনের ধাক্কার কথা মনে

করে বলচেন, আদর্শবাদ, প্রেম ও-সকল বড় বড় কথার ফাঁদমাত্র। আসল জিনিষটা হচ্ছে জীবনযাত্রার ষ্টাইল বজায় রাখা। যে যেমন ষ্টাইলে অভ্যস্ত তার স্বামীগৃহে তার অতিমাত্রায় অদল-বদল হ লেই মর্ম্মান্তিক কষ্ট। অতএব——”

“অতএব আমার মা পসারওয়ালা বড় ব্যারিষ্টার কিংবা মোটা মাইনের সিভিলিয়ান জামাইরূপে চান।”

সরজিৎ ভাবিয়া কহিল, “আমার কি মনে হয় জান বিজয়া! সাংসারিক হিসেবে তোমার মার মতামতই সত্য। আমাদের বাংলাদেশে একটা প্রবাদ বচন আছে, ‘সুখের চেয়ে স্বস্তি ভালো’। তুমি এবং আমি যদি জীবনে স্বস্তি পেতে চাই তাহলে আমার উচিত মধ্যবিত্ত ঘরের একটি সুশ্রী শান্ত নম্র মেয়ে বিয়ে করা। যে একটিমাত্র ঠিকা-ঝি সম্বল করে সংসার চালাতে পারবে, কোনদিন যদি সে ঝি অনুপস্থিত রইলো, নিজেই কয়লা ভেঙ্গে উনুনে আঁচ দেবে, বাসন মেজে নেবে, ছাড়া-কাপড়ে সাবান দেবে। কোন মাসে টানাটানি হ’লেও অক্লেশে সু-গৃহিণীর মত সংসার চালিয়ে নেবে। আর তোমার উচিত এমন কোন লোককে বিয়ে করা যার বয়স, রূপ, গুণের তালিকায় কৃপণতা থাকলেও খরচের বেলায় যে অকৃপণ। তোমার মোটর, শাড়ি, অলঙ্কার, রেডিও, সিনেমা, স্বাচ্ছন্দ্য, অগাধ অবসর সমস্তই যার বাড়ীতে গেলে অক্ষুণ্ণ থাকবে।

বিজয়া হাসিয়া কহিল, “আর আমরা যদি সুখী হতে চাই

তাহলে আমাদের কী করা উচিত ? বলনা, তোমার মুখে শুনি। এইমাত্র তুমি গর্ব্ব করছিলে, তুমি রোমান্টিক্ নও। অতএব তোমার বর্ণনায় রোমান্সের রঙ লাগিয়োনা। যা সহজ সত্য তাই বল। আচ্ছা, আমি কি চেষ্টা করলেও তোমার বর্ণিত মধ্যবিত্ত ঘরের সেই সুশ্রী সুশীল নম্র মেয়েটি হতে পারিনে ?"

"না পারোনা। মনে মনে তাকে তুমি ধারণা করতে পার, মনের জোরে বলতে পার, আমি ইচ্ছে করলে, চেষ্টা করলেই অমনি হতে পারি, কিন্তু সে চেষ্টার ফলে কাজ কিছুই হবেনা, তোমার জীবন ভেঙ্গে পড়বে। আশৈশবের অনচ্ছেদনীয় সংস্কার, তাকে কি কেবল মনের জোরে এড়াতে পার ?"

বিজয়া ক্ষীণ হাসিয়া কহিল, "তোমার মত অমন করে শাদা চোখে আমি জগত্তকে দেখতে পারিনে। সমস্ত বিচার বিবেচনা সুবিধা ভালো মন্দকে উড়িয়ে দিয়েও আমাদের সুখী হবার অধিকার রয়েচে। বল, নেই কি ?"

—"আমি জানিনে বিজয়া। আজ আমাকে উঠতে দাও, তোমার মায়ের সঙ্গে কাল কিছুক্ষণ কথা হয়েছিল, তারপর থেকে আমার মন ভারি চঞ্চল হয়ে রয়েচে। এই কিছুক্ষণ আগে তুমি যখন আসোনি, তোমার শূন্যঘরে জানলার কাছে দাঁড়িয়ে তোমাদের টেনিসকোর্টের দিকে চেয়েছিলেম। অনেক কথা মনে হোল, তোমাকে বলে ফেল্লেম। যা বললেম তাও যেমন মিথ্যে নয়, এরপরে একা আমার নির্জ্জন-ঘরে যখন বসে থাকব, ঝাউগাছের

আড়ালে নিঃশব্দে চাঁদ ডুবে যাবে তখন যে কেবলই তোমার মুখ তোমার কথা মনে পড়বে সে-ও তেমনি একান্ত সত্য। আমি যাই, আর বেশিক্ষণ একা আমার সঙ্গে বসে গল্প কোরো না। সেটা অন্যায় হবে। কত লোকে হয়তো কত কি মনে করতে পারে।"

*

* *

কলেজে আজ বিজয়া চুপ করিয়া এক কোণে আসিয়া বসিল। পাশে একটি মেয়ে ফিশ-ফিশ করিয়া তাহার কাণে কাণে কহিল, "বিজয়া আজ এত গম্ভীর কেনরে? কিছু ভালো লাগচেনা এই ইতিহাসের বক্তৃতা শুনতে। আকবর লেখাপড়া জানতেন বা জানতেননা তা জেনে আমার লাভ? বড় বয়েই গেল ওই সব গভীর গবেষণামূলক তথ্য নিয়ে মাথা ঘামাতে। যেন আমার নিজের জীবনের সমস্যা কিছু নেই?"

"ঠিক বলেচিস। আমাদের নিজেদের কত ভাবনা মাথা কুটে মরচে, কিছুতেই উত্তর পাচ্চেনা। কেন বাজে ভাবনা ভাবব।"

বিজয়া হাতের বইটা নামাইয়া রাখিল।

"আয়, মাঠে যেয়ে বসিগে।"

"তার চেয়ে কমনরুমে চলনা। কোন লোকজন নেই।"

দু'জনে বাহিরে চলিয়া আসিল আস্তে আস্তে।

মলিনা বলিল, "তোর খবর কি বল? আমি কিছু বুঝতে পারিনে, ফাজিল মেয়েরা নানা কথা বলাবলি করে। আমি ওদের কথায় কাণ দিইনে। কিন্তু কিছু একটা হয়েচে বলে মনে হচ্ছে।"

"ওদের কথা বাদ দে, মেয়েরা কিনা বলাবলি করে থাকে বল? একজনের সঙ্গে আমার আলাপ হয়, তার কথা মাঝে মাঝে ভাবি। ঠিক বুঝে উঠতে পারিনে তাকে। মানুষটাকে একরকম মনে হয়, কিন্তু তার মুখের কথা অন্যরকম লাগে। আচ্ছা মলিনা, তোর বাবা কী কাজ করেন?"

"আমার বাবা পোষ্টাল-বিভাগে সামান্য চাকরি করেন। কিন্তু আজ তুই অত্যন্ত অন্যমনস্ক রয়েচিস, নইলে কি কথা থেকে হঠাৎ কি কথা বলে ব'সলি।"

"না, ঠিক কথাই জানতে চাচ্ছি। আচ্ছা মলিনা, বাড়ীতে তোকে কিছু কাজ করতে হয়?"

"সবই করতে হয়। আমার মায়ের শরীর ভালো নয়। আমার বৌদি সকালের দিকের রান্নাটা করেন। কলেজ থেকে ফিরে গিয়ে আমি রাত্রির রান্না করি। প্রাইভেট মাষ্টারের মাইনে দিতে গায়ে লাগে, আমার ছোট ছোট ভাই বোনদের আমিই পড়াই। তা ছাড়া ঘর-সংসারের আরও কত ছোটখাট টুকি-টাকি কাজ আছে।"

"আচ্ছা, আমাকে একদিন তোদের বাড়ী নিয়ে যাবি ?"

"যেদিন খুসী যাস। আমি কিন্তু বুঝতে পেরেচি একটু একটু, সরজিৎবাবুর অবস্থা ভালো নয়। নয় কি ? তাঁর বয়স কত বল দেখি ?"

"তুই তাহলে নামও শুনেচিস ? হ্যাঁ, তিনি গরীবের ছেলে। বয়স আর কত হবে, একুশ বাইশ, বাইশের বেশি হবেনা।"

"ওমা তাই বুঝি! ছেলেমানুষ! পুরুষমানুষের বাইশ-বছর বয়স কি বয়স নাকি ? তখন যে তারা ছেলেমানুষ থাকে আর ছেলেমানুষের মত কথা বলে। আমি বুঝেচি সে তোকে ছেলেমানুষের মত আবোলতাবোল অনেক কথা বলেচে। সেন্টিমেণ্টাল র‍্যাবিশ।"

"না না, সে সেন্টিমেণ্টাল নয়।"

মলিনা ক্ষীণ হাসিয়া কহিল, "এখনও সেন্টিমেণ্ট আছে, পরে আর থাকবেনা। আমি অবাক হয়ে ভাবি বিজয়া, বাংলা দেশে সেন্টিমেণ্ট করবার অবসর ক'জন বাঙ্গালী যুবকের থাকে ? তোদের কথা ছেড়েদে। তোদের মত অবসর আছে, টাকা আছে, এত সুযোগ ক'টা লোকের ? পেটের দায়ে যাদের সকাল থেকে রাত্রি অবধি টো টো করে ঘুরে বেড়াতে হয়, তাদের অবসর কোথা প্রেম নিয়ে আলোচনা ক'রবার, অবসর কোথা কাব্যচর্চ্চার। আমাদের আধুনিক-সাহিত্য যে কত মিথ্যে, তা কি এইখানেই বুঝতে পারিসনে, সেখানে সর্ব্বত্র প্রেমের আর রোমান্সের

ছড়াছড়ি। বেশির ভাগ বইয়ে প্রেমের মনস্তত্ত্ব নিয়ে ন্যাকামি, উচ্ছ্বসিত ঘনঘটা। কিন্তু সমাজের জীবনে আজ প্রেমেরই তো সব চেয়ে অভাব।"

"কেন?"

"বুঝতে পারিসনে? যে তরুণ ছাত্র কলেজে দেস্‌দিমোনো, মীরন্দা, শকুন্তলা, ডি, লা, মেয়ার পড়ে রসের সাগরে সাঁতার কাটচে, দু'দিন পরে সংসারের ভার পড়বে তারই কাঁধে। সে তখন হয়ত মার্চেন্ট-অফিসের দুয়োরে দুয়োরে উঞ্ছের মত ঘুরে বেড়াবে······নো ভেকেন্সি! নেই নেই, জায়গা নেই।······ দু'টো জগতের মধ্যে কত বড় ব্যবধান। কী দারুণ আঘাত অপেক্ষা করে রয়েচে, জীবনের আগাগোড়া লণ্ডভণ্ড হয়ে যাবে সে আঘাতে। তাই কলেজের ছেলেদের মুখের পানে আমি যখন চাই, আমার মায়া হয়। মনে মনে জানি এদের বেশির ভাগ কপালে কী অখণ্ডনীয় ললাটলিপি লেখা রয়েচে।"

বিজয়া কহিল, "তোর কথার সঙ্গে সরজিতের কথার এত মিল রয়েচে, ওর সঙ্গেই যদি তোর বিয়ে হোত, বেশ হোত। ঠিক মিলে যেত।"

মলিনা হাসিয়া বলিল, "নারে বিজয়া, না। তোর কোন ভয় নেই। সরজিতের চেয়ে অনেক খারাপ ছেলের সঙ্গেও আমার কস্মিনকালে বিয়ের আশা নেই। বিয়ে হবে কোথা থেকে, আমার বাবার টাকা কই! তাই-না অনেক কষ্টে কোনরকম করে

খরচ জুটিয়ে কলেজে পড়চি। কিছু একটা করে খেতে হবে তো!"

*

* *

"দিদি! জলদি তৈরী হয়ে নাও। ওমা একি, এখনও তুমি গা ধোওনি, কাপড় ছাড়নি! ব্যাপার কি বলতো দেখি? মা এদিকে চটে আগুন হবেন! পাঁচটা প্রায় বাজে। তোমারই জন্মতিথি, অতিথি যাঁরা আসবেন, তাঁদের তোমাকেই করতে হবে অভ্যর্থনা। আর তুমি এখন ঘরের কোণে মুখ গুঁজে বসে বই পড়চ।"

বিজয়ার ছোট বোন সুমিতা চঞ্চল চরণে ঘরে ঢুকিয়া তাহার দিদিকে তাড়া দিয়া গেল। কিন্তু এত তাগিদ সত্ত্বেও বিজয়ার আচরণে কোন চাঞ্চল্য কোন উৎসাহ দেখা গেলনা। একটু হাই তুলিয়া বইটা মুড়িয়া রাখিয়া কহিল, "মিথ্যে কেন এত গোলমাল করচিস সুমি? কী, হয়েচে কি ব্যাপারটা? আসবে তো যত রাজ্যের সেই বাজে লোক, সেই বাঁধাগৎ-চালে হবে পুরোণ মান্ধাতার আমলের কথাবার্ত্তা, কয়েকটা বেসুরো ড্রইং-রুমের গান। তার জন্যে এত কি?"

সুমিতা অবাক হইয়া হাঁ করিয়া শুনিতেছিল, বড় বড় দুই চোখ বিস্ফারিত করিয়া কহিল, "মাকে বলিগে তবে—"

"থাম, কী বলবি ?"

"বোলব, অনবরত বই পড়ে পড়ে দিদির কাব্য-রোগ হয়েচে, কিছুই আর ভালো লাগচেনা। শুধু একলা নিরিবিলিতে শুয়ে কড়িকাঠের দিকে চেয়ে থাকবে।—আর কিছুই কোরবেনা, করতে পারবেনা।......"

"বেশি ফাজলামি করিসনে। যা যা, এখান থেকে যা। তোর যা খুসী বানিয়ে বলগে যা। আমি কেয়ার করিনে।"

বেণী দুলাইয়া সুমিতার অন্তর্দ্ধানের মিনিট-পাঁচেক পরে তাহার মা গম্ভীরমুখে ঘরে ঢুকিলেন। আসিয়া অদূরবর্ত্তী একটা চেয়ারে বসিলেন। ভাবখানা—'রণং দেহি।'

বিজয়া নির্ব্বিকারচিত্তে বসিয়া রহিল।

তাহার মা'ই জলদগম্ভীরস্বরে প্রথমে আরম্ভ করিলেন, "বিজয়া, তোমার এতক্ষণ তৈরী হয়ে নেওয়া উচিত ছিল, কেন যে নাওনি বুঝতে পারচিনে। কিন্তু তোমাকে আমি একটা কথা জিজ্ঞেস কর্ত্তে চাই, সরজিৎকে আজ নিমন্ত্রণ করা হয়নি, এইজন্যেই কি তোমার আজকের ব্যাপারের উপর এত তাচ্ছিল্য ?"

বিজয়া কোন কথার উত্তর না দিয়া ঘাড় বাঁকাইয়া উদ্ধতভাবে একদিকে মুখ ফিরাইয়া রহিল।

তাহার মা বলিয়া চলিলেন, "কিন্তু তুমি জান তোমার বাবার কত আপত্তি আর আমারও……"

বিজয়া হঠাৎ উঠিয়া পড়িয়া কহিল, "মা, ওসব কথা থাক। এখন তোমারও সময় নেই আর আমারও নেই। একদিন সময়-মত মুখোমুখি আমি তোমাকে কয়েকটা কথা জিজ্ঞেস কোরব। আচ্ছা, তুমি যখন বলচ, আমি তৈরী হয়ে নিচ্চিগে।"

তাহার মাকে দ্বিতীয় কথার অবসর না দিয়া বিজয়া ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

বিজয়ার জননী সরোজিনী দেবী কিছুকাল মুখ ভার করিয়া বসিয়া রহিলেন, তাহার পর আস্তে আস্তে উঠিয়া পড়িলেন, তাঁহারও এখন রাজ্যের কাজ বাকী। বড় হল-ঘরটায় বেহারাকে দিয়া কার্পেট পাতাইতে হইবে, ফুলদানিগুলাতে ফুলের তোড়া দিবার বন্দোবস্ত করিতে হইবে। রান্নাঘরের ভাঁড়ারকও কিছু কিছু না করিলেই নয়।

* * *

"মিস চ্যাটার্জ্জি, আপনি দয়া করে এইবারে একটা গা'ন।"

হল-ঘরে উজ্জ্বল আলো জলিতেছে, মিউজিক-টুলের উপর সুবোধ বসু এই অনুরোধ করিলেন। সবেমাত্র তিনি একটা গান গাহিয়া শেষ করিয়াছেন। এখন সমাগতা মেয়েদের মধ্যে একটি সুবেশা মেয়েকে সম্বোধন করিয়া তিনি ঐ কথা বলিলেন।

রেখা চ্যাটার্জ্জি রুমালে মুখ মুছিয়া কহিলেন, "গাইবো?

কিন্তু আজ তেমন সুবিধায় হবে বলে মনে হচ্ছেনা। শরীরটা তেমন ভালো নেই, গলাটাও......"

বিজয়া অন্য সকলের অলক্ষ্যে ধীরে বাহির হইয়া আসিল। সামনের বারান্দাটা পার হইয়া ছাদে আসিয়া দাঁড়াইল। ছাদে আরও একজন কে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, বিজয়া অর্দ্ধ-অন্ধকারে প্রথমটা ঠাহর করিতে পারে নাই, মনে করিয়াছিল ফিরিয়া যায়। আর একটু কাছে সরিয়া আসিতেই বুঝিতে পারিল, আর কেহ নয়, তাহার বাবা দাঁড়াইয়া আছেন।

"তুমি এই অন্ধকারে একলা দাঁড়িয়ে কেন, বাবা?"

বিজয়নাথ এইদিকে মুখ ফিরাইলেন, "এমনই দাঁড়িয়ে রয়েচি, মাঁ। অনেক লোকের গোলমাল ভালো লাগ্‌লোনা, আজ অফিসে বড় খাটুনী গেচে, এইখানে বেশ ঠাণ্ডা বাতাস দিচ্চে; বেশ নিরিবিলি, তাই এসে বসলেম।"

বিজয়া তাহার বাবার পাশে কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল চুপ করিয়া, তারপর হাসিয়া উঠিয়া কহিল, "বাবা, জানো একটা মজা হয়েচে? সেদিন তোমার লাইব্রেরী গোছাতে যেয়ে তোমার একটা খাতা পেয়েচি আমি। তোমার কতদিন আগেকার ডায়েরি। যেই-না পাওয়া, অমনি সব পড়ে ফেললেম।"

বিজয়নাথ নিকটস্থ আরাম-চৌকিতে বসিয়া পড়িয়া স্নিগ্ধহাস্তে কহিলেন, "পড়ে ফেলেচ তো মালক্ষ্মী! বেশ কোরেচ। যদিও ওই খাতার পাতায় তোর যে বাবার দেখা পেয়েচিস সে এখন

গতায়ু, কিন্তু তার গতজীবনের অভিজ্ঞতা যদি তার মেয়ের কোন কাজে লাগে সে সুখী হবে। কিন্তু আজকে এই উৎসবের দিনে তুই এখানে কেন বুড়ি ? তোরই-না জন্মদিন, তাই জন্তে এই সব হচ্ছে !”

“আগে আমার কথার জবাব দাও, তুমিই বা বাড়ীর কর্ত্তা হয়ে উৎসবের দায়িত্ব ফেলে এখানে কেন ?”

“আমি ! আমি আর তুই এক হোলেম ! আমি বুড়ো হয়েচি, তাছাড়া সারাদিনের খাটুনীর পর দু’দণ্ড নিরালা ভালো লাগে। ভাল লাগেনা ঐ সব গোলমাল, আমোদ প্রমোদের কোলাহল। কিন্তু তোর ভালো লাগা উচিত।”

“আমার যে ভালো লাগেনা, এমন কথা বললে বুড়োমি হবে। মাঝে মাঝে ভালো লাগে। কিন্তু আজ ভালো লাগচেনা। মনে মনে একটা কথা ভাবচি, সেজন্তে মনটা চঞ্চল রয়েচে।”

বিজয়নাথ তাঁহার মেয়ের নিকটস্থ হইয়া কহিলেন, “দেখ বুড়ি, তুই যা ভাবচিস, তার বিষয় আভাসেই আমি জানতে পেরেচি। তোর জীবনের এই সমস্তায় আমি যদি কিছু সাহায্য করতে পারি তাহলে আমাকে জিজ্ঞেস করতে সঙ্কোচ করিসনে। আমি জানি সরজিৎ তোকে ভালোবাসে, শ্রদ্ধা করে। কিন্তু তার বয়স কম, তার আর্থিক অবস্থা ভালো নয়, তার জীবনের কিছুই এখন গড়ে ওঠেনি। দু’টোর মধ্যে কিছুতেই মিল হচ্ছে

না। কেমন, এইটেই এখন তোর জীবনের সবচেয়ে বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েচে, নয় ?"

বিজয়া একটু চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল, "বাবা, তুমি যখন আমাকে সহজ খোলাখুলিভাবে প্রশ্ন করলে, তখন আমিও লজ্জা কোরবনা। সরজিৎবাবুকে তুমি একটু-আধটু জান। তার প্রকৃতির মধ্যে একটা কঠিনতা আছে। প্রেমে পড়ে গদ গদ হওয়া, হিতাহিত ভুলে যেয়ে আত্মহারা হওয়া তার ধাতে লেখেনি। সে হচ্চে নিজের সম্বন্ধে অতি সচেতন, এবং অপরের সম্বন্ধেও। আমাকে সে বলছিল কয়েকদিন আগে যে, 'আমি রোমান্টিক-টাইপের নই এবং আশা করি তুমিও নয়। আমাদের মধ্যে অবস্থার তফাৎ এত বেশি যে মনে হয় তাতে আমাদের ভবিষ্যৎ-জীবনের মিলন সুখের হবেনা। এই দরকারী কথাটা ভুলে যেয়ে যেন ব্যাপারটা আগাগোড়া রোমান্সের রঙে একাকার করে তুলোনা।'——

কিন্তু আমি তার কথা মনের সঙ্গে মেনে নিতে পারিনি বাবা। টাকার চেয়ে বড় জিনিষ কি আজ পৃথিবীতে এতই দুর্লভ ? আমার সঙ্গে বিয়ে দেবার উপযুক্ত যেসব ছেলেকে মা মনে মনে আঁচ করে রেখেচেন তাদের সঙ্গে, তাদের পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে আমি অনেক মিশেচি। কী অন্ধকার সেখানে, প্রাণহীন সুখহীন আমোদের বন্যা, আর তার চেয়েও অন্ধকার যে সেখানে সত্যিকার মহত্ব কিছুই নেই। জীবন-যাত্রায়, ব্যবহারে, স্বভাবে

কোথাও এতটুকু উচ্চচিন্তা উচ্চভাব কিছুই নেই। কলের মত অর্থহীন পুনরাবৃত্তি। সরজিৎবাবুকে আমি যা দেখেচি, তার চোখে যে আলো যে আত্মার জ্যোতি ফুটে বেরুচ্চে, তার কাছে এ সমস্ত তুচ্ছ অর্থহীন বলে মনে হয়। তার জন্তে দুঃখ পাওয়া, দুঃখকে বরণ করে নেওয়া আমার কাছে ঢের বড় জিনিষ মনে হয়। তোমার কি মনে হয় জানিনে, বাবা।"

"আমার কাছেও বড় মনে হয়। কিন্তু ক্ষমতা আর অক্ষমতা বলে একটা জিনিষ দুনিয়াতে আছে। সরজিৎকে বিয়ে করে সারাজীবন তারই সঙ্গিনী হয়ে তার সঙ্গে ষ্ট্রাগল্ করবার ক্ষমতা আর যারই থাক, আমাদের বাড়ীর মেয়েদের নেই।······"

শেষের দিকে বিজয়নাথের গলার স্বর রুদ্ধ হইয়া আসিল। তিনি বলিতে লাগিলেন, "আমার কথাটা বর্ণে বর্ণে সত্য। এর একবিন্দুও বাড়িয়ে-বলা নয়, বিজয়া। আমি তোর কথা বুঝতে পেরেচি, আর নিজের চোখেও তো দেখচি—আমাদের সমাজের আধুনিক ছেলে-মেয়েদের মনের মিলন, অনুরাগ, বিবাহ, এগুলো দিন থেকে দিনে কত তুচ্ছ কত অকিঞ্চিৎকর হয়ে উঠচে। আজকে দেখা গেল প্রেমপরিপূর্ণ আদর্শ বিবাহ, মাসকতক পরে সেইখানেই দারুণ মনোমালিন্য, অশান্তি, কলহ। পরস্পরের সঙ্গে কোনই মিল যেন আর নেই। য়ুরোপেও যে এত গুনিস ডাইর্ভোস, সেপারেসেনের মামলা, এত নিঃশব্দ দ্বেষ ঘৃণা পুঞ্জীভূত হয়ে উঠ্চে,

তার সবচেয়ে বড় কারণটা আমার কি মনে হয় জানিস? তারা দু'জনে মিলে একসঙ্গে জীবনে কিছু গড়ে তোলেনি, তাই তাদের মিলিত জীবনে একতার বন্ধন বলেও কিছু জিনিষ নেই। আমি কি বলতে চাচ্ছি তুই বুঝি ঠিক বুঝতে পারচিসনে, বিজয়া—আমার ঠাকুমার গল্প তোকে বলি শোন। আমার ঠাকুরদা টিউশনি করে, স্কলারশীপ পেয়ে সেই বৃত্তির টাকায় কোনরকম করে কায়ক্লেশে বি-এ অবধি পড়ে পাশ করলেন। যতই কষ্ট পা'ন, বরাবর কিন্তু ভালো করে পাশ করে এসেচেন। প্রত্যেক পরীক্ষাতে ফার্ষ্ট। সুরুতে এণ্ট্রেন্স থেকে একটি বড়লোকের ছেলে সহপাঠী ছিল—কিছু বন্ধুত্বও ছিল। সে কিন্তু এণ্ট্রেন্সের গণ্ডী কিছুতেই পার হতে পারলোনা। তার বাবা পশ্চিমের ওদিকের প্রকাণ্ড জমিদার। রাজামহারাজ-গোছের বললেই হয়। তিনি প্রস্তাব করলেন, এইখানে এসে আমার ছেলেটিকে প্রাইভেটে পড়াও। একটি খোলার বাড়ী থাকবার জন্যে আর মাসে গোটা-কুড়ি করে টাকা হাতখরচের মত মাইনে। ঠাকুরদা তাতেই স্বীকার হলেন। না হলেও উপায় ছিলনা। আই-এ পড়তে পড়তেই তাঁর বিয়ে হয়। শুনে তোর খুব অবাক লাগচে, না বিজয়া? কিন্তু তখনকার কালে এইরকমই ছিল। মা বাপে কোথা থেকে দেখে-শুনে দশ-এগারো বছরের একটা টুকটুকে বৌ করে দিলেন। সে কে, সে কেমন, এইবার থেকে তার চিরজীবনের দায়িত্ব আমারই ঘাড়ে এসে পড়লো,

তার খাওয়া পরা, সুখ দুঃখ, মান অপমান সমস্তর জন্যই আমিই একান্তভাবে দায়ী ; এ সকল গভীর গবেষণার সে সময়ও পায়না, প্রবৃত্তিও হয়না। যখন চমকে ফিরে এই দিকটায় নজর পড়ে যায় তখন দেখতে পায় একটি কোমল বন্ধন বড় নির্ভরতায় বড় সন্তর্পণে তাকে জড়িয়ে ধরেচে।····· কিন্তু তোকে যে গল্পটা বলতে সুরু করেছিলেম—মাসিক তিনটাকা ভাড়ায় একটা খোলার বাড়ীতে আমার ঠাকুরদা তাঁর স্ত্রীকে নিয়ে এলেন। বড়লোক-জমিদারের ছেলেটিকে পড়ানো বাদে আরও এক জায়গায় ছেলে-পড়ানো জোটালেন, আর সেই সঙ্গে সঙ্গে প্রাইভেটে ল' পড়তে লাগলেন। উকীল হতে চার পাঁচ বছর লাগলো। ইতিমধ্যে একটি ছেলে হয়েচে। ওকালতী পাশ করে আদালতে বেরুলেন, তারপরে অনেক ধৈর্য্য এবং সংগ্রামের পরে খুব নাম করে ফেললেন্। কিন্তু ততদিন আমার ঠাকুমা সংসার চালিয়েছেন, এক পয়সার কচুর শাক নারকেল দিয়ে সুস্বাদু করে রেঁধে—একখানা ভিজে কাপড় গায়ে শুকিয়ে। যখন দু'খানা কাপড় খুব ছিঁড়ে যেত, তখন দু'খানারই ভালো অংশটুকু কেটে নিয়ে জোড়া দিতেন সেলাই করে নিয়ে। তারপরে যখন অদৃষ্ট প্রসন্ন হো'ল, একটা সম্পন্ন গৃহস্থালী গড়ে উঠলো, তখন সে-সৃষ্টি হয়ে দাঁড়ালো স্বামী স্ত্রী দু'জনেরই তিল তিল কষ্ট দিয়ে গড়ে তোলা। তার মধ্যে মিশিয়ে রয়েচে দু'জনের কতদিনের কত মর্ম্মান্তিক কষ্ট, কত ক্লেশ, কত অরুন্তুদ ত্যাগ স্বীকার। একে

কি তারা তুচ্ছ করতে পারে? সামান্ত একটুখানি কুয়াশায় কি হিমালয় ঢেকে যায়? এত বড় দুঃসহ দুঃখ দু'জনে সমানভাবে বণ্টন করে নিয়ে যা গড়ে তুললো, তার উপর মমতা কত বেশি! একটু মনোমালিন্ত, একটু মতবিরোধ এরই জন্তে কি তারা পারে একে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করতে। এই জিনিষটারই অভাব ঘটেচেরে বিজয়া আজ—ঘরে ঘরে। অতি উন্নত আধুনিক-সমাজে ডেপুটি স্বামী আই-এ পাশ মেয়ে ঘরে আনচেন। মনে মনে জানেন তাঁর জীবনের গড়ে ওঠায় এ-মেয়ের কোন স্থান নেই, ছিলোনা, থাকবেনা। সে তাঁর শারীরিক এবং মানসিক স্বাস্থ্য অনুকূল রাখবে, তিনিও তার বিলাসিতা তার সখ তার সন্তানসমেত তার দায়িত্ব নেবেন। এ ছাড়া আর কোন কিছু বন্ধন নেই। মেয়েটিও শিক্ষাদীক্ষা পেয়ে নিজের জীবন একভাবে গড়ে নিয়ে চাকুরে-স্বামীর ঘর করতে এসেচে। সে জানে সকালে উঠে যদি নিজের হাতে স্বামীকে চা একপেয়ালা করে দেয়, পাঞ্জাবির ছেঁড়া-বোতামগুলো সেলাই করে রাখে, চাকরটাকে শাসন করে তাহলেই যথেষ্ট করা হবে।"

বিজয়া বলিল, "বাবা, তোমার কথা শুনে আমার মনের অনেক জটিল চিন্তার ধারা সহজ হয়ে আসচে। তুমি নিজের জীবনেই প্রত্যক্ষ করেচ, এই বন্ধনহীন মিলনের ব্যর্থতা। তাহলে আমাকে আবার কেন ঠেলে দিচ্চ ঐ নিরর্থক আবর্ত্তের মধ্যে!"

বিজয়নাথ হাসিয়া কহিলেন, "না না, তুই জীবনে দুঃখ পাস,

এ আমরা চাইনে বুড়ি। কিন্তু যেভাবে মানুষ হয়েছিল, এখন কি দরকার হলে রান্না করে বাটনা বেটে সংসার চালাতে পারিস! কিছুতেই পারবিনে। সেইদিকের কথাটা ভাবতে হবে।"

"কেন আমাদের এমন করে মানুষ করলে?"

"ভাববার সময় পাইনি মা। বাইরের কাজে কত সময় যায় দেখেচ তো? যখন ফিরে আসি, পোষাকটা ছেড়ে বসবার মত সামর্থটুকুই বাকী থাকে। টাকা রোজগারের চিন্তায় জীবনের পনেরো আনা সময় ব্যয়িত হয়ে গেল, এক আনা যা উদ্বৃত্ত রইল তাতে আর কোন গভীর কথাই ভাবা চলেনা। সে ভাবনায় ভার নিলেন তোমার মা। অন্তঃপুর তাঁকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠ্‌লো। ছেলে মেয়েদের তিনি কী শেখালেন, কী পড়ালেন, কেমন করে মানুষ করলেন, আজ অবধি ভালো করে জানিনে!"

পিতা-পুত্রীর কথাবার্ত্তার মাঝে একটা ছেদ পড়িল। বিজয়ার মা ব্যস্ত-সমস্ত-ভাবে আসিয়া কহিলেন, "এ কী হচ্চে, কী এ? সবাই বসে রইলেন, যার জন্মদিন তাকে সবাই খুঁজচে, আর উনি চুপি চুপি পালিয়ে এ'লেন।"

স্বামীর দিকে চোখ পড়ায় জ্বলিয়া উঠিয়া কহিলেন, "তুমিই আরও প্রশ্রয় দিয়ে দিয়ে ওকে বাড়িয়ে তুলেচ। ভদ্রসমাজে মেশবার যোগা নয়, ও। সাধারণ ভদ্রতাজ্ঞান অবধি যার নেই......"

বিজয়নাথ শান্তকণ্ঠে ধীরে কহিলেন, "বুড়ি, মা'র সঙ্গে যা।

বুঝে তোর মা সরজিতকে তোর জন্মদিনে নিমন্ত্রণ করেননি। আজ তাকে এখানে আসতে বলেচি, মানে—সন্ধ্যের দিকে এখানে এসে চা, একটু জলটল খাবে। উঠি এখন·· ···বেয়ারা, গোসল ঠিক হ্যায়?"

বিজয়নাথ উঠিলেন। বিজয়া তাহার নিজের ঘরে আসিয়া চুপ করিয়া বসিল। আজ তাহার কলেজ নাই। জানালা দিয়া কিছুক্ষণ পরে চোখে পড়িল পিতার মোটর হাইকোর্ট অভিমুখে চলিয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে মৃদু পদশব্দ পাইয়া মুখ ফিরাইয়া দেখিল, মা আসিতেছেন।

একটা আসন্ন যুদ্ধের জন্য সে প্রস্তুত হইতে লাগিল। বিজয়ার মায়ের নাম সরোজিনী দেবী। যৌবনে তিনি ক্ষীণাঙ্গী ছিলেন, এখন ক্রমশঃ মোটা হইয়া পড়িতেছেন। একটা খালি চেয়ারে বসিয়া পড়িয়া কহিলেন, "এরই মধ্যে তোর স্নান সারা হয়ে গেছে বিজয়া? পাখাটা খুলে দিসনি কেন? এখনো গরম যায়নি।" তিনি নিজেই উঠিয়া পাখার সুইচ্ টিপিয়া পাখাটা চালাইয়া দিলেন। মাথার উপর বন্‌বন্ শব্দে পাখা ঘুরিতে লাগিল, হাওয়ার বেগে বিজয়ার খোলা চুল মৃদু মৃদু আন্দোলিত হইতে লাগিল। মাতা পুত্রী দু'জনেই নীরব। কিছুকাল পরে সরোজিনী দেবী একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, "বিজয়া, তোর বয়সে মানুষের কতকগুলো প্রবৃত্তি খুব উগ্ররকমের থাকে। আমারও ছিল।"

"কী ছিলো ?"

"মনের কতকগুলো একঝোঁকা ভাব। আদর্শবাদের উপর খুব একটা মোহ।"

"এখন আর নেই ?"

"আছে, কিন্তু জীবনের সঙ্গে সামঞ্জস্য করে নিয়ে তারা মিলে মিশে আছে। আগেকার মত একরোখা হয়ে একটা অশান্তির সৃষ্টি করে নেই।"

"তা'হলে আগেকার চেয়ে তুমি সুখী ? মানে, এখনকার জীবনে তুমি আগেকার চেয়ে কি অনেক বেশি সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য পেয়েচ ?"

সরোজিনী কিয়ৎকাল ভাবিয়া কহিলেন, "তা পেয়েচি বইকি।"

বিজয়া ধীরে ধীরে মস্তক সঞ্চালন করিয়া কহিল, "আমার কিন্তু মনে হয়, পাওনি। বরঞ্চ আগেকার চেয়ে দিন থেকে দিনে আরও সাধারণ হয়ে পড়চ।"

সরোজিনী ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া কহিলেন, "আমার সমালোচনা থাক্। আমি তোমাকে যা জিজ্ঞেস করতে এসেচি, তাই করতে দাও। তোমার মত বয়সে আমরাও একদিন ঢের কাব্য করেচি।"

বিজয়া হাসিয়া ফেলিয়া কহিল, "তাহলে এই বয়সে যা করা উচিত, আমি তাই করচি।"

সরোজিনী অধিকতর উত্তেজিত হইয়া বলিলেন, "মা'র সঙ্গে

কেমন করে কথা কইতে হয় তাও বোধকরি ভুলে গেছ। কিন্তু আমি তোমাকে বলতে চাই, নিজের জীবন সম্বন্ধে এমন প্রকাণ্ড একটা ভুল কিছুতেই করে বোসনা, এরপরে চিরজীবন আফ্‌শোষ করে মরবে। সরজিতের কথা ভুলে যাও, ওসব আইডিয়া একেবারে পরিত্যাগ কর।”

বিজয়া কহিল, “আমার মনে কোন মৎলব নেই, আমি আপাততঃ বিয়ে করবার জন্যেও ব্যগ্র হয়ে উঠিনি। তবে ও বড়লোক নয় বলে যে ওর সঙ্গে তোমরা আমাকে মিশতে বা বন্ধুত্ব করতে দেবেনা, তা'ও হবেনা।”

ক্রোধে বিজয়ার মায়ের মুখ লাল টক্‌টকে হইয়া উঠিয়াছিল, বলিলেন, “ওসব বন্ধুত্ব-ফন্ধুত্ব রেখে দাও। ওরকমতরো বড় বড় কথা ঢের শুনেচি।”

বিজয়া চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, “ছেড়ে দাও ওসব আলোচনা। মা, তুমি এখন রেগে রয়েচ। কিন্তু আমি নিজের সম্বন্ধে নিজের ভাবনা-চিন্তার দায়িত্ব নিতে চাই। তোমাদের না জানিয়ে কোন অন্যায় কোরবনা, এটুকু দায়িত্বজ্ঞান আমার রয়েচে। কিন্তু তা'ই বলে তোমার আঁচল-ধরা পুতুলও হতে পারবো না। জীবনটা যে কত ভয়ঙ্কর, কত আশ্চর্য্য, কী গভীর সেইটে আমি ধীরে ধীরে অনুভব করতে চাই। তোমার হুকুমমত একজন বড়লোককে বিয়ে করে একটি রঙীন পুতুল বনে যেতে চাইনে।”

"রঙীন পুতুল! বিজয়া, তোমার এতটা অধঃপতন হয়েচে তা আমি স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারিনি। রঙীন পুতুল! জানো, মেয়েমানুষের বিবাহ-বন্ধন একটা ধর্ম্ম!"

বিজয়া পুনরপি হাসিয়া ফেলিয়া কহিল, "জানি বইকি, ক্রমশঃ সেই ধর্ম্মের সোপানে উঠ্‌বো। এত তাড়া কি।"

বিজয়ার মা বিস্ফারিত নেত্রে তাঁহার এই দুর্ব্বিনীত কন্যার পানে চাহিয়া রহিলেন।

*

* *

সন্ধ্যার মৃদু বাতাসে টেবিলের ঢাকার শুভ্র ঝালরগুলা কাঁপিতেছিল। বিজয়া সরজিতের দিকে খাবারের থালাটা অগ্রসর করিয়া দিয়া কহিল, "এত বক্তৃতার পরে শেষে সেই বড় চাকরি বাগাবার জন্যে বিলেত যাচ্ছ?"

সরজিৎ মুহূর্ত্তে উদ্দীপ্ত হইয়া কহিল, "কী বলচ, কক্ষনো না! আমি যাচ্চি বিজ্ঞানের সাধনায় ....."

বিজয়া হাত তুলিয়া কহিল, "থামো থামো বাক্যবাগীশ, সব জিনিষের সম্বন্ধেই অত বড় বড় কথা বানিয়োনা। অন্ততঃ এইটুকু ভাববার সুখ আমাকে দাও যে তুমি আমাকে পাবার জন্যে খুব একটা অসাধ্য সাধন কিছু করতে যাচ্ছ।"

"সেটা মিথ্যে কথা বলা হবে। তোমার এমনই কী দাম যে তোমার জন্যে অসাধ্য তপস্যা করতে হবে। তুমি তো জান আমি রোমান্টিক নই।"

মুহূর্ত্তের জন্য বিজয়ার মুখ বিবর্ণ হইল, তাহার পর জোর করিয়া হাসিয়া কহিল, "জানি বইকি, কিন্তু আমাকে পাবার জন্যে যে তোমাকে সাধনা করতে হবেনা, তাই বা তুমি জানলে কেমন করে? জানোনা তুমি, তপতীর জন্যে রাজা সম্বরণকে কত তপস্যা করতে হ'য়েছিল!"

"ওঃ, সে কোন মহাভারতীয় যুগের কথা! তখনকার দিনে নারী ছাড়া সাধনার বস্তু ছিলনা। আজকের দিনে বিজ্ঞান ছাড়া সাধনার জিনিষ নেই।"

ইহার পর আর কথা জমিলনা, দু'জনেই চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

কিছুক্ষণ পরে বিজয়া কহিল, "আচ্ছা, ওদেশে যেয়ে আমাকে চিঠি লিখবে তো?"

"লিখব।"

আবার দু'জনে চুপচাপ।

সরজিৎ উঠিয়া পড়িয়া কহিল, "এবারে উঠি।"

বিজয়া হঠাৎ ছলছলচক্ষে বলিয়া উঠিল, "তুমি আমার উপর রাগ করেচ?"

সন্ধ্যার ম্লান আভায় তাহার সেই চোখের দিকে চাহিয়া

সরজিতের মন টন্‌টন্‌ করিয়া উঠিল, মুখ নীচু করিয়া কহিল, "বিজয়া, তোমাদের সমাজের ষ্টাইল বজায় রাখবার মত অর্থ উপার্জ্জনের যোগ্যতা যদি কোনদিন অর্জ্জন করতে পারি, তবেই……"

বিজয়া মাথা দোলাইয়া কহিল, "না না, ওকথা বোলোনা। তুমিও—ওকথা বো'লোনা। জানোনা তুমি এ-বাড়ীতে আমার স্থান কোনখানে। একটা স্বাধীন মতামতের জন্যে কতখানি অপমান সইতে হয়, যদি জানতে… ."

তাহার চক্ষুর পল্লবপ্রান্ত সজল হইয়া আসিয়াছে।

সরজিৎ তাহার একটা হাত চাপিয়া ধরিয়া কহিল, "কিন্তু যদি তুমি আমার ভাগ্যের সঙ্গে ভাগ্য মেলাতে চাও তবে আজই—এখনই সেই সাহস সঞ্চয় কর। তোমার বাবা প্রস্তাব করেছিলেন, তাঁর টাকা নিয়ে বিলেত যাই, একটা কেষ্ট-বিষ্টু কিছু হয়ে আসি তারপর……"

বিজয়া হাসিয়া ফেলিয়া কহিল, "তুমি কি বাঘ না সিংহ যে আমাকে যথেষ্ট সাহস সঞ্চয় করতে হবে।"

"তার চেয়েও ভয়ঙ্কর!"

তাহার দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া বিজয়া কহিল, "ঐ ভয়ঙ্করের জন্যেই তো আমি এতখানি নির্লজ্জ হলেম। চিরকাল পড়ে আসচি, পুরুষেরাই কত বাধা বিপত্তি ডিঙ্গিয়ে মেয়েকে জয় করে আনে—আজ আমার জীবনে তার উল্টো দেখলেম….."

বিজয়ার কথায় বাধা পড়িল। তাহার মা গম্ভীরমুখে ঘরে ঢুকিলেন। ভূমিকামাত্র না করিয়া কহিলেন, "এ হতেই পারেনা সরজিৎ! তোমার কি-ই বা বয়স, তুমি কতটুকু বোঝ! আমি তোমাকে মিনতি করচি, আমার মেয়ের জীবন এমনভাবে নষ্ট করে দিয়োনা। জীবনটা কাব্য নয়। তোমরা দুই ছেলেমানুষে মিলে এত বড় সত্যিটাকে ভুলে বসে থেকনা।"

সরজিৎ তাঁহার নিকটস্থ হইয়া শান্তস্বরে কহিল, "মা, আপনি আপনার মেয়েকে যথার্থভাবে বাঁচবার অধিকার দিন। জীবনে দুঃখ কষ্ট আছে, সেটা নতুন কথা নয়। কিন্তু আপনাদের প্রাণহীন এই সমাজযন্ত্রের পেষণে—যার প্রাণ আছে আগে থেকেই দুঃখ কষ্টের কথা ভেবে তাকে মারবেন কেন?"

সরোজিনী দেবী উদ্দীপ্ত হইয়া কহিলেন, "তোমার মত ছেলের মুখে বড় বড় কথা শুনতে আমি আসিনি, আমি তোমাকে বলতে এসেচি, তুমি আমাদের বাড়ী আর এসোনা।"

"বেশ, আসবনা—যদি আপনাদের বাড়ীর সকলেরই এক মত হয়।"

"একটা বাড়ীর ভিতর ক'টা মত থাকে বলে তুমি মনে কর?"

বিজয়া নিঃশব্দে দাঁড়াইয়াছিল, মৃদুস্বরে কহিল, "আচ্ছা তুমি যাও। আমি একটা কথা ভেবে দেখব।"

*

* *

সরজিতের ছোট্ট একতলা বাড়ীতে রান্নাঘরে কেরোসিনের ডিবে জ্বলিতেছিল। তাহার মা ঝোলে মাছ ছাড়িয়া দিতে দিতে কহিলেন, "তুই বললি, লেখাপড়া শিখে শেষ করে তবে বিয়ে করবি। এখন এইতো বি-এ পাশ করেচিস্, এর পরে বাছা আর ওজর আপত্তি আমি শুনচিনে।"

আসন পাতিয়া সরজিৎ খাইতে বসিয়াছিল, বলিল, "মিথ্যে কেন বিয়ের জন্যে জেদাজেদি করচ মা! সে দিনকাল আর নেই যে বিয়ে করতে যাবার সময় তোমাকে বলে যাব, মা তোমার দাসী আনতে চললেম আর এনে হাজির করব'ও একটি তাই। এখন বৌ এলে তোমারই খাটুনি হবে দ্বিগুণ। সকালে উঠেই চা তৈরী করে সুমুখে ধরতে হবে।"

মা অঞ্চলপ্রান্তে চক্ষু মার্জ্জনা করিয়া কহিলেন, "তা হোক বাছা, তোদের সুখের জন্যে যে খাটুনি তা কি আমার গায়ে লাগে! আর তুই কি চিরদিনই এমনি থাকবি, কত টাকা রোজগার করবি। তখন এই একতলা দালান রাজ-অট্টালিকা হবে।"

সরজিৎ হাসিয়া বলিল, "ঐ সব স্বপ্ন নিয়েই থাক মা। কিন্তু আপাততঃ তোমার সঙ্গে একটু জরুরী কথা আছে। তোমার

কাজকর্ম্ম চট্‌পট্‌ সেরে নাও। পাশের ঘরে নিরিবিলিতে বলতে চাই।"

রান্নাঘরের কাজ কর্ম্ম সারিয়া, হাত-পা মুছিয়া মা আসিয়া এ-ঘরে বসিলেন। এটি সরজিতের ঘর। তাহার লেখাপড়া; শোওয়া ব'সা সমস্তই এইখানে চলে। চেয়ারে বসিয়া সে গভীর অন্যমনস্ক দৃষ্টিতে ঘড়ির দিকে চাহিয়াছিল। বলিল, "তুমি এসেচ, আমি ভারি একটা সমস্যায় পড়ে গেছি মা। নিজে একলা ভেবে কিছুতেই কিছু স্থির করতে পারলেমনা, তাই তোমাকে ডেকে আনলেম ছেলেমানুষী করে।"

মা সস্নেহে হাসিয়া কহিলেন, "তোর ছেলেমানুষী কি আর আজ নতুন দেখচি ; চিরকালই যে এই দেখে আসচি। আচ্ছা, এখন কথাটা কি বল।"

সরজিৎ সোজা হইয়া বসিয়া কহিল, "তুমি তো জান আমি বরাবরই কুনো-প্রকৃতির, কখনো কোথাও যাইনে, কোথাও মিশিনে। কিন্তু যে কলেজে আমি পড়েছিলেম, সেই কলেজেই একটি মেয়ে পড়ত……"

মা অবাক হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "সে কিরে, যে কলেজে তোরা পড়িস সেই কলেজে মেয়েরা কি পড়বে !"

"কেন মা, তুমি কি জানোনা যে আজকাল অনেক কলেজে ছেলেরা ও মেয়েরা একত্রে পড়বার রীতি আছে? তারপরে শোন, সেই মেয়েটির সঙ্গে আমার আলাপ হয়। সে খুব বড়-

লোকের মেয়ে। কেমন করে তার ধারণা হয়, অধিকাংশ অলস বড়লোক-সম্প্রদায়ের মেয়েদের মত সে'ও অমনি কোন গভীর কাজই জীবনে করতে পারবেনা যদি ওদের স্রোতে ভেসে যায়। আমি তার ওসব কথার সমর্থন করতেম, মাঝে মাঝে তার সঙ্গে নানা আলোচনা হোত। তারপরে কেমন করে জড়িয়ে গেলেম। তারও পরের ইতিহাস, তুমি নিজে তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমতী, অনায়াসে বুঝে নেবে। এখন আমাকে বাদ দিলে নিজের জীবন থেকে, সে অসুখী হবে এইটুকু আমি নিঃসন্দেহে বুঝতে পেরেচি। কিন্তু তুমিই ব'লনা মা, আমাদের এই ঘরকন্নার মাঝে অত বড়-লোকের মেয়ে কি মানায় ?”

মা গম্ভীর হইয়া নিবিষ্টমনে শুনিতেছিলেন। বলিলেন, “সেই মেয়েটি কেমন না দেখলে কেমন করে বলব সরজিৎ! কিন্তু তুমি অন্যায় করেচ। যাকে নিজের জীবনের অবস্থার সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারবেনা, তার সঙ্গে কেন মেলামেশা করলে।”

তিনি আর কিছু না বলিয়া সেখান হইতে উঠিয়া গেলেন।

সরজিৎ মনে মনে বুঝিতে পারিল তিনি রাগ করিয়াছেন। মাকে সে ভালো করিয়াই জানে। তাঁহার মতামত উদার, কিন্তু কোনখানে লেশমাত্র অন্যায় তিনি সহ্য করিতে পারেননা। জীবনযাত্রার শৈথিল্য বা মনের আবেগের খামখেয়ালিতা এতটুকু তিনি সহ্য করিতে রাজী নহেন। এ-অভ্যাসও সরজিৎ তাঁহার নিকটেই পাইয়াছে।

রাত্রির অন্ধকারে দুই চক্ষু মেলিয়া সে সমস্যার সমাধান খুঁজিতে লাগিল এবং সমস্ত ভাবনাচিন্তাদ্বন্দ্বের অতীত একটা আনন্দ তাহার মনকে উদ্বেলিত করিয়া রাখিল। একটি মেয়ে তাহাকে চায়, এ-কথাটার আত্মপ্রসাদের দিকটাই তাহার কাছে বিরাট হইয়া দেখা দিতেছে। কিন্তু সে'ও যে বিজয়াকে অমনি করিয়াই চায়, এ-দিকটা এখনো তাহার কাছে অনাবৃত হইয়া দেখা দেয় নাই।

*

* *

সকালের ডাকে একখানা চিঠি আসিল তাহার নামে। হাতের লেখাটা চেনা। বিজয়ার কাছ হইতে এই তাহার প্রথম চিঠি। সে লিখিয়াছে, "কাল অনেকরাত্রি অবধি বাবা আমার সঙ্গে গল্প করছিলেন। তাঁর কাছেই শুনলেম, গভর্ণমেণ্ট তোমাকে যে বৃত্তি দিতে চা'ন, তাতে তোমার বিলেতে থাকার এবং শিক্ষার খরচের অর্দ্ধেকটা নির্ব্বাহ হবে। বাকী অর্দ্ধেকটা তিনি তোমাকে দিতে চা'ন। তুমি নেবেনা কেন? নাও, অস্বীকার কোরোনা। অন্ততঃ ধার ব'লেও তো নিতে পার। আমি তোমার কথা ভাবি, মনে মনে তোমার জন্য উদ্বিগ্ন, [সেইজন্যেই কথাটা বলতে সাহস ক'রলেম।"

সরজিৎ কিছুকাল ভাবিয়া উত্তর লিখিতে বসিল, "দেখ বিজয়া, তোমার বাবার সাহায্য আমি নিতে পারতেম যদি তোমাদের বাড়ীর সকলেরই এতে সায় থাকত। কিন্তু তুমি জান, তা নেই। যেখানে একপক্ষ থেকে অনুগ্রহের দাবী থাকে সেখানে পাত-পেতে বসা আমাকে দিয়ে কিছুতেই হবেনা। কোন সুবিধা কোন লোভ, কোন ভালোবাসার আকর্ষণ দিয়েই তা সম্ভব করতে পারবনা। অতএব আমাকে তুমি ক্ষমা কোরো।"

বিজয়া কলেজের গাড়ীর জন্য খুব ব্যস্ত হইয়া সোফারকে তাগাদা করিতেছিল, এমন সময়ে সরজিতের চিঠিখানি আসিল। অত্যন্ত অধীর-আগ্রহে সে চিঠিখানা খুলিয়া পড়িয়া দেখিল, মুহূর্তের জন্য তাহার মুখ বিবর্ণ হইয়া উঠিল। তাহার পরে চাকরকে বলিল, "যা, ড্রাইভারকে বলেদিগে, আমি আজ কলেজে যাবনা, আমার শরীর ভালো নেই।"

চাকরটা এক মুহূর্তের জন্য অবাক হইয়া মুখের দিকে তাকাইল, এই একটুখানি আগেই কিনা, তাহার প্রতি একেবারে ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া বিজয়া অন্যরকম হুকুম করিয়াছিল। কিন্তু বড়লোকের খেয়ালের অন্ত পাওয়া ভার এই বোধে সে যথা নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য সমাপন করিতে চলিয়া গেল।

বিজয়া একেবারে দোতলায় তাহার ঘরে আসিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া চিঠিখানা আর একবার খুলিয়া বসিল। তখন নিস্তব্ধ। মধ্যাহ্নবেলার আতপ্ত মাদকতা চারিদিকে ঘনাইয়া

আসিতেছিল, সেই বিরলতা এবং নির্জ্জনতার সহিত তরুণীর মনের আবেগ আসিয়া মিশিল। সে মনে মনে বার বার করিয়া কহিল, 'তিনি বড়লোকই হোন বা নির্ধনই হোন, তাঁর যা পথ আমারও সেই পথ। যাঁহাকে একবার মন দিয়াছি সে মনের বিচারকর্ত্তা আর আমি নহি, তাঁর যা খুসী তাই করিবেন।' মনের এমনই ভাবাবেগের মধ্য দিয়া কতখানি সময় যে কি করিয়া কাটিল বিজয়ার তাহা স্মরণও ছিলনা। এমন সময়ে তাহার চমক ভাঙ্গিল তাহাদেরই বাড়ীর নীচেরতলায় একটা সম্মিলিত কোলাহল শুনিয়া। নানা লোকের কলরবের মাঝে তাহার মায়ের বুকফাটা তীব্র একটা আর্ত্তনাদ বিজয়ার কাণে যাইতেই সে লাফাইয়া চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িল। সিঁড়ি দিয়া নামিয়া আসিতে, ঠিক সিঁড়ির মুখেই যে দৃশ্যটি তাহার নজরে পড়িল, আজও তাহা মনে পড়িয়া যায় যখন, তাহার হৃৎস্পন্দন থামিয়া আসে। তাহার বাবার রক্তাক্ত অচেতন দেহ একটা ষ্ট্রেচারে করিয়া বহিয়া কয়েকজন ছেলে দাঁড়াইয়া আছে। তাহার মা কাতর আর্ত্তনাদ করিতেছেন, চাকর-বাকর ভীড় করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। এইতো কয়েকঘণ্টা আগে তাহার অমন সুন্দর স্বাস্থ্যময় সহাস্যমুখবাবা মোটরে করিয়া কোর্টে বাহির হইয়া গেলেন, ইহারই মধ্যে এমন কি হইল, ভগবান এত নিষ্ঠুর কেমন করিয়া হইলেন! এক মুহূর্ত্তের জন্য যেন তাহার জ্ঞান হারাইয়া আসিল। সিঁড়ির রেলিংয়ে ভর দিয়া

নিজেকে সংবরণ করিয়া লইয়া সে সঙ্গের একটি ছেলের নিকট অগ্রসর হইয়া গিয়া ব্যাপারটা কি জিজ্ঞাসা করিল। সে বলিতে লাগিল, "আজ কোর্টে তেমন হয়তো কাজ ছিলনা, এঁর শরীরটা বোধ হয় আগেথেকেই ভালো ছিলনা। বাড়ীর গাড়ি আসতে দেরী ছিল, তাই ইনি ঠিক করেছিলেন খানিকটা এগিয়ে এসে চৌরঙ্গীর কাছে মোটর নেবেন। ইতিমধ্যে হঠাৎ মাথা ঘুরে ওঠে এঁর, একটা মোটর চলে যায় এঁর পাশ দিয়ে····· চোট লেগেছে। তখনই হাঁসপাতালে নিয়ে আসা হয়, এঁর পকেটে কার্ড থেকে জানা যায় পরিচয়। আপনারা ভাববেন, তাই এইখানেই···· ····"

বিজয়া তাহার মায়ের একটা হাত চাপিয়া ধরিয়া কহিল, "মা, উতলা হ'য়োনা। এখন আমাদের যথাকর্ত্তব্য করতে দাও।"

সে সঙ্গের একটি ছেলের হাতে একখানা চিঠি লিখিয়া দিয়া বলিল, "মোটর ঠিক আছে, আপনি চট্ করে চলে যান। আমাদের পারিবারিক ডাক্তার একজন আছেন, এই খামের উপর তাঁর ঠিকানা। ঐ ঠিকানায় তাঁর সঙ্গে দেখা করে তাঁকে সঙ্গে নিয়ে আসুন এবং তিনি যদি ভালো বোধ করেন আরও দু'একজন ডাক্তার সঙ্গে আসুন।"

ছেলেটি সঙ্গে সঙ্গে চিঠি লইয়া বাহির হইয়া গেল।

বাড়ীর সরকারকে ডাকাইয়া বলিয়া দিল, "সরকার মশাই, এই ফর্দ্দমত জিনিষগুলো আপনি যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি কিনে

পাঠিয়ে দিন। সঙ্গে একজন লোক নিয়ে যান, আর এই চিঠি-খানায় যাঁর নাম লেখা রয়েচে তাঁর হাতে দেবেন একেবারে। আর কাউকেই দেবেননা।"

রবার-ক্লথ, ফিডিংকাপ্—রোগীর যাহা কিছু প্রয়োজনীয় বস্তু ফর্দে লিখিয়া দিল এবং সঙ্গে সরজিতকে একখানা চিঠি দিল—তাহাদের বিপদের এই খবর লিখিয়া, তাহাকে এখনই আসিতে বলিয়া।

বিজয়নাথকে সন্তর্পণে তাহার কক্ষের প্রশস্ত শয্যায় আনিয়া শোওয়ান হইল। তাঁহার মাথার কাছে বসিয়া বিজয়া আকুল অধীরচিত্তে ডাক্তারের প্রতীক্ষা করিতেছিল। কয়েকমিনিট পরেই মোটরের ভেঁপু শোনা গেল। তাহাদের পারিবারিক ডাক্তার ছাড়াও আর একজন গম্ভীরমুখে তাঁহার পিছু পিছু ঘরে ঢুকিলেন।

কিছুক্ষণের জন্য রোগীর আত্মীয়স্বজন কাহারও ও-ঘরে ঢুকিবার অনুমতি রহিলনা।

বিজয়া বাহিরের বারান্দায় দাঁড়াইয়াছিল, দেখিল, সরজিৎ উদ্বিগ্ন মুখে ঢুকিতেছে।

"কী হয়েচে ?"

বিজয়া সজলনয়নে সমস্ত ঘটনা বলিয়া, কহিল, "কি করব আমি যে কিছুই বুঝতে পারচিনে। মাকে তো সাম্লানো শক্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাঁর ঘন ঘন ফিট হচ্ছে। বড়দা মেজদা

দু'জনেই রইলেন বিলেতে। আজ সাত আট বচ্ছর ধরে সেখানে কি পড়াই যে পড়চেন তাঁরাই জানেন। তাঁদের টেলিগ্রাম করতে হবে।"

সরজিৎ বলিল, "অত ব্যস্ত হয়োনা বিজয়া, দেখতে দাও ডাক্তারে কি বলেন, তারপরে সেইমত সব ব্যবস্থা করব। একমাত্র তুমিই এ বাড়ীর মধ্যে স্থির আর নির্ভরযোগ্য রয়েচ, তাই থাক।"

*

* *

ডাক্তারের রায় আসিল, যেমন অমোঘ তেমনই নিষ্ঠুর।

বাঁচিবার আশা প্রায় নাই। মোটরে দুর্ঘটনা যেটা হইয়াছে সেটা সামান্য। পাশ দিয়া তাঁহার গা-ঘেঁষিয়া একটা মোটর চলিয়া গিয়াছে মাত্র, সামান্য একটু লাগিয়াছে। কিন্তু ওভাবে আহত হইবার পূর্ব্বেই তিনি মাথা ঘুরিয়া পড়িয়া যান। তাঁর হার্নিয়া ছিল, ষ্ট্র্যাঙ্গুলেটেড্ হার্নিয়া।

অপারেসন্ হইল কিন্তু জ্ঞান ফিরিলনা। সবুজ রঙের আলো-ভরা শয়নকক্ষের একধারে অজ্ঞান অবস্থাতেই বিজয়নাথ চলিয়া গেলেন। একেবারে চলিয়া যাইবার আগে কাহারও

সহিত একটা কথা বলিতে পারিলেননা, মনের শেষ ইচ্ছাও ব্যক্ত করিতে পারিলেননা।

বিজয়ার মা শেষদিনে শক্ত হইয়া উঠিয়া বসিলেন। স্বামীর শিয়রে আসিয়া স্থির হইয়া সেই যে বসিলেন—বসিয়াই রহিলেন। একমুহূর্ত্তের জন্তও তাঁহাকে উঠিতে দেখা গেলনা বা একটা হা-হুতাশ করিতে শোনা গেলনা। সেবা শুশ্রূষার যাহা কিছু কাজ, সরজিৎ এবং বিজয়া করিতে লাগিল। বিজয়নাথের দুই ছেলে, দু'জনেই বিলেতে থাকিয়া ব্যারিষ্টারী পড়িতেছে, একজনের শেষ হইয়া গিয়াছে পড়া, সে দেশ দেখিয়া বেড়াইতেছে। তাহাদের কাছে তার গেল।

একজনের পৃথিবীর নিকট হইতে নিষ্ঠুর বিদায়ের দিন আসন্ন হইয়া আসিল। আকাশে শুকতারা ম্লান হইয়া নিভিয়া আসিল। সেই সঙ্গে সঙ্গে বিজয়নাথের জীবন-প্রদীপ স্তিমিত হইয়া শেষ হইয়া গেল।

* * *

এখন বাড়ীর একেবারে অন্তরকম চেহারা। সমস্তই ছন্নছাড়া, কোথাও কোন শৃঙ্খলার লেশ নাই। বিজয়ার দুই দাদা, নরেন সুরেন বিলেত হইতে সন্তপ্রত্যাগত। তাহাদের ষ্টাইলে অমিতাচারের শেষ নাই। এককথায় সবই যেন বদলাইয়া গেছে। বিজয়া সকালের দিকটায় তাহার নিজের ঘরে বসিয়া পড়াশোনা করিতেছিল। বাবা মারা যাওয়ার পর হইতে কলেজ

যাওয়া সে ছাড়িয়া দিয়াছে। কিছুতেই মন বসেনা, পড়াতেও বসিতেছিলনা, তবুও বসিয়াছে একটা বই লইয়া। সময়টা কোন রকম করিয়া কাটানো চাই। তাহার মেজদা স্থরেন ঘরে ঢুকিল, বিশেষ কোন ভূমিকা না করিয়াই কহিল, "বিজয়া, এ-ঘরটা না হলে কি তোর কোন অস্থবিধে হবে? তা যদি নাহয় তবে মাসখানেকের জন্মে এ-ঘরটা ছেড়ে দিতে পারিস?"

মুখ তুলিয়া বিজয়া প্রশ্ন করিল, "কেন?"

"আমার এক বন্ধু সস্ত্রীক আসচেন, মাসখানেক এখানে থাকবেন। তাঁদের স্থখ স্থবিধার জন্মে আমাদের যতদূর সম্ভব বন্দোবস্ত করা উচিত। বড় যে-সে লোক তো নন্, মিঃ মুখার্জ্জি একটা ডিষ্ট্রীক্ট-ম্যাজিষ্ট্রেট্। আর তাঁর স্ত্রীর কথা কি ব'লব, এত একম্‌প্লিশ্‌মেণ্ট্ যে একটিমাত্র মেয়ের থাকতে পারে তা আমার ধারণার অতীত! রাঁধেন এদেশের আর ওদেশের ডিশ, দুই-ই যেন অমৃত। পিয়ানো-বাজানো শুনলে মুগ্ধ হয়ে যেতে হয়।......"

বিজয়া মুখ নীচু করিয়াছিল। মনে মনে হঠাৎ যেন তাহার অত্যন্ত অভিমান বোধ হইতেছিল। একজন অপরিচিত অজ্ঞাত-কুলশীল অতিথির জন্য তাহাকে নিজের শয়নকক্ষ ছাড়িয়া দিতে হইবে! বাপের একমাত্র মেয়ে ছিল আদরিণী, অভিমানিনী—বুঝিতে পারিল, সে-সমস্ত দাবী-দাওয়া তাঁহার সঙ্গে সঙ্গেই চলিয়া গিয়াছে।

কিন্তু মনের ভাব গোপন করিয়া মুখে বলিল, "বেশ তো, এই ঘরই যদি তোমার এত পছন্দ হয়ে থাকে, নাওনা মেজদা! আমার যে কোন একটা ঘর থাকলেই হোল।"

সুরেন শিষ দিতে দিতে প্রফুল্লমুখে বলিল, "বেশ, তাহলে বেয়ারাকে ডেকে বলে দিস, তোর জিনিষগুলো উত্তরদিকের কোণের ঘরটায় রেখে দেবে। তারপরে ধুইয়ে-মুছিয়ে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে ফেলে ঘরখানাকে সাজাতেও সময় লাগবে।"

সুরেন চলিয়া যাইবার পর বিজয়া উঠিয়া মায়ের ঘরে গেল। বাবা মারা যাওয়ার পরে তাহার মায়ের সমস্তই একবারে বদলাইয়া গেছে। দিনান্তে একবারও ঘরের বাহির হননা, কাহারও সহিত কথা বলেননা, নিঃশব্দে নিজের মধ্যে নিমগ্ন।

ধীর পদসঞ্চারে মায়ের ঘরে ঢুকিয়া দেখিতে পাইল, তিনি প্রতিদিনের মত খোলা জানালার কাছে চুপ করিয়া বসিয়া আছেন। বিজয়া তাঁহার খুব কাছে সরিয়া গিয়া বসিল।

"মা, কী এত সারাদিন ব'সে ভাবচ?"

"আমাদেরই জীবনটা আগাগোড়া মনে পড়ে যায় মা! তোমার বাবার কত কথা—প্রথম জীবনে আমরা দু'জনে যখন সংসার পেতে বসি তখন কোথায় বা ছিলে তোমরা, কোথায় ছিল

এইসব ঘরবাড়ী মোটর ইলেক্‌ট্রিক-লাইট। তখন যেন তিনি বড় কাছেই এসেছিলেন আমার......"

কথার মাঝখানে তিনি আত্মবিস্মৃত বা অন্যমনস্ক হইয়া গেলেন, চোখ দিয়া কয়েক ফোঁটা অশ্রু গড়াইয়া পড়িল।

বিজয়ার নিজের চোখও শুষ্ক ছিলনা। চোখ মুছিয়া কহিল, "মা, তোমার মনের অবস্থা দেখে আমার কষ্ট হয়, আর তার-চেয়েও বেশি কষ্ট হয়, আমাদের এই বাড়ীর এই অবস্থায় তোমাকে একা ফেলে রেখে যেতে হবে। কিন্তু তবুও আমি আর থাকতে পারবনা।"

বিজয়ার মা আশ্চর্য্য হইলেননা, সহজভাবে বলিলেন, "জানি মা, তোমাকে যেতে হবে, আমার কাছে তুমি থাকবেনা। নাইবা থাকলে, আর আমি তোমাকে বাধা দেবনা। তুমি যা ভালো বলে মনে করেচ, যাঁকে ভালোবেসে যাঁর ঘর সসম্মানে করতে পারবে বলে মনে মনে সংকল্প করেচ, সেই পথে যাও। আমি তোমার সংকল্পে বাধা আর দিতে চাইনে। সুখ দুঃখ মানুষের অদৃষ্টের কাজ। আমি তোমার জন্যে ভেবে আকুল হচ্ছি, হয়তো আমার এই ভাবনার মধ্যেই তোমার দুঃখের কারণ থাকতে পারে - না না, ওসব কিছু নয়।" আমি নিজের স্বার্থ আর নিজের বুদ্ধি দিয়ে আর কিছু ভাববনা।"

বিজয়া তাহার মাকে প্রণাম করিয়া কহিল, "মা, আজ প্রথম তোমার সম্মতি পেলেম, আজ আমার পক্ষে

শুভদিন। আমার পথে তোমার আশীর্ব্বাদের আলো এসে পড়ল।”

সেইদিনই সে সরজিতকে চিঠি লিখিল—

“এ-বাড়ীতে তুমি আসতে পার, আর বাধা নেই। তুমি জান, বাবা তোমাকে মনে মনে কত ভালোবাসতেন। মা আজ সেই ভালোবাসার কাছে পরাভূত হয়েচেন। তোমাকে তিনি আহ্বান করেচেন, তোমার হাতে তাঁর মেয়েকে দিতে আর তাঁর কোন আপত্তিই নেই। তাছাড়া আর একটা কথা বাকী আছে, সেটা তুমি ধারণাও করতে পারবেনা। বাবা যখন ছিলেন, তখন তাঁর বাড়ীতে আমার যে স্থান ছিল, এখন তিনি নেই, এখন সেখানে আমি তার কণামাত্রও পাবোনা। তুমি স্বীকার কর বা নাই কর, আমার মান অপমানের দায়িত্ব এখন তোমারই।”

এমন চিঠি পাইবার পর কোন পুরুষমানুষেই স্থির হইয়া থাকিতে পারেনা, সরজিতও পারিলনা। তাহার অভিমান তাহার দারিদ্র্যের তীক্ষ্ণ-আত্মসচেতনতা সমস্তই একাকার হইয়া ভাঙ্গিয়া চুরিয়া মিশিয়া গেল।

ইহার পরে দুইজনের পথ এক হইয়া মিলিতে আর কোন বাধা রহিলনা। ফাল্গুনের এক স্নিগ্ধরাত্রিতে বিনা আড়ম্বরে বিজয়ার সহিত সরজিতের বিবাহ হইয়া গেল।

*

* *

বিজয়ার মা মেয়েকে খানকতক দামী গয়না ছাড়া আর কিছুই দিতে পান নাই। স্বামীর মৃত্যুতে মন তাঁহার তখনও আত-মাত্রায় উদ্‌ভ্রান্ত ছিল আর দিবার মত কিছু ছিলওনা। ছেলেরা তর্ক করিয়া তাঁহার কাছে প্রতিপন্ন করিল, বাবা নগদ টাকা তেমন কিছুই রাখিয়া যান নাই, কেবল রাখিয়া গিয়াছেন একটা প্রকাণ্ড ষ্টাইলের সংসার। অতঃপর এইটাকে বহিয়া বেড়াইতেই তাহাদের প্রাণ ওষ্ঠাগত হইবে।

বিজয়া হাসিমুখে তাহার জীর্ণ একতলা শ্বশুরবাড়ীতে গিয়া উঠিল। প্রথমমিলনের অভাবনীয় বিস্ময়ের ঘোরে দিন কাটিতে লাগিল।

শাশুড়ি রান্নাঘর ও ভাঁড়ারঘরের প্রান্তবর্ত্তী ছোট একখানা ঘর নিজের জন্ত রাখিয়া বাকী বাড়ীটা ইহাদের জন্ত ছাড়িয়া দিলেন। বিজয়া কোমরে আঁচল জড়াইয়া লাগিল ইহাকে সাজাইয়া তুলিতে। পিতার প্রাসাদতুল্য বাড়ীতে সকলের চেয়ে ভালো ঘর ছিল তাহার জন্য নির্দ্দিষ্ট, কিন্তু সেখানে সম্মান নাই—সেখানকার কথা আর নয়। সরজিতের এই ছোট জীর্ণ বাড়ীই তাহার পক্ষে স্বর্গ।

রাত্রি প্রায় ন'টা বাজে। এখনও সেলাইয়ের কলের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়া বিজয়া দরজা জানালার পর্দ্দা সেলাই করিতেছে। বাড়ীটায় আর একবার রঙ ফিরাইয়া, মিস্ত্রীকে দিয়া দরজা জানালায় রঙ লাগাইয়াছে। দু'একটা হাল্কা-খাট, দু'একটা ফার্নিচার আনাইয়াছে। দু'খানি মোটে ঘর। একটি তাহাদের শয়নকক্ষ, অন্য ঘরটি সরজিতের পড়িবার জন্য সাজাইয়াছে।

সরজিৎ বাহিরে গিয়াছিল, পর্দ্দা ঠেলিয়া ঢুকিল।

"কী করচ, সেলাই? না, তোমাকে নিয়ে আর পারা গেলনা বিজয়া। এমন চমৎকার রাত্রিটা বাইরে নষ্ট হচ্চে, এস। চল বাইরে গিয়ে একটু বসিগে।"

ছাদে উঠিবার সিঁড়ি আছে—ঘর নাই। বিজয়া সমস্ত ছাদ পরিষ্কার করিয়া পাটি পাতিয়া রাখিয়াছিল।

সেইখানে, সেই জ্যোৎস্নার আলো-পড়া-ছাদে বসিয়া দু'জনে দু'জনের মাঝে তন্ময় হইয়া গেল। কত ভবিষ্যতের কথা, কত জ্ঞান-বিজ্ঞান দর্শনের কথা, জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর কথা। তখন মনে পড়িবার অবকাশও থাকিলনা যে বিজয়ার স্বামীগৃহ লইয়া গর্ব্ব করিবার মত কিছুই নাই। কলিকাতার একপ্রান্তে তুচ্ছ একতলা একখানা বাড়ী, একটি বিধবা মা এই লইয়াই তাহার স্বামীর সংসার।

সরজিৎ গোটা-দুই টিউশনি করিত এবং ল' পড়িত। তাহার মায়ের নিজের পুঁজি কিছু ছিল, বিধবা তাহাই ভাঙাইয়া অনেক

আশায় ছেলেটিকে লেখাপড়া শিখাইয়া মানুষ করিতেছিলেন। তাঁহার মনে আশা ছিল, চরমে একদিন ফল ধরিবে। তখন যাহা দিয়াছেন শতগুণে তাহাই ফিরিয়া পাইবেন।

একদিন একান্তে তিনি বিজয়াকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "হ্যাগো বৌমা, তা বাছা তোমার বাপের বাড়ীর ঐশ্বয্যির তো অনেক বর্ণনা শুনেচি, কিন্তু কই, বিয়ে হয়ে পর্য্যন্ত একটি কাক পক্ষীকেও তো খবর নিতে দেখলেম না।"

লজ্জায় বিজয়া মাথা নামাইল, ব্যাপারটা সত্যই এত বিসদৃশ! কিন্তু তাহার বাপের বাড়ীতে আজকাল যা' কাণ্ড! তার বড়দা মেজদা যেভাবে জীবন কাটাইতেছে—সারাদিন হৈ-চৈ! বাড়ীতে সর্ব্বদাই ইয়ার-বন্ধুদের ডাকিয়া আনিয়া হল্লা, অধিক রাত্রিতে মদ খাইয়া বাড়ীতে ফিরিয়া যথেচ্ছাচার! বিজয়ার মা মাস-দুই হইল কাশ্মীরে তাঁহার ছোট-বোনের কাছে চলিয়া গেছেন। ছোট-বোনের স্বামী সেখানকার বড়-চাকুরে। তিনি গিয়াছেন, ভালোই করিয়াছেন। এক হিসাবে তাঁহার জন্য বিজয়া নিশ্চিন্ত। আর কিছু না হোক মনে তিনি শান্তি পাইবেন সেখানে। কিন্তু তিনি চলিয়া যাইবার পরে নরেন সুরেনের ব্যবহার আরও উদ্দাম হইয়া উঠিয়াছে! সেখানে যাইয়া একবেলা কাটাইয়া আসিতেও বিজয়ার আর প্রবৃত্তি হয়না।

শাশুড়ির কথার উত্তরে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া সে কহিল,

"আমার বাপের বাড়ীর যা কিছু সে সমস্তই আমার বাবার সঙ্গে সঙ্গে ধুয়ে মুছে গেছে। ওখানকার কথা আর তুলবেননা মা। আমার মনে বড় কষ্ট হয়।"

তাহার শাশুড়ি কিছুকাল মুখ গম্ভীর করিয়া বসিয়া থাকিয়া কহিলেন, "তুলবোনা মা, তুলবোনা। কিন্তু তুলি কি আর সাধে! প্রথম যখন সরজিৎ এসে আমায় বললে, মা, একটি মেয়েকে আমি বিয়ে করতে চাই, তার বাবা এত বড়লোক, অত বড়লোকের মেয়ে কি আমাদের ঘরে মানাবে? তখন আমি ভেবেছিলেম, যদিবা না-মানায়, যাতে মানায় তার বাপ নিশ্চয়ই সেই ব্যবস্থা করে দিয়ে যাবে, অন্ততঃ আমার ছেলেকেও তিনি একটুখানি সাহায্য করবেন, যাতে বাছা-আমার দশজনের একজন হয়ে দাঁড়াতে পারে। এখন যে দেখছি কোথাও কিছু নেই। এতটুকু সাহায্য সে পেলেনা কারো কাছ থেকে—উপরন্তু ভার বাড়লো।"

সরজিতের মায়ের এই আক্ষেপোক্তির কতকটা কারণ ছিল। একা নিজের ঘাড়ে সংসারের সকল দায়িত্ব ভাবনা-চিন্তা গ্রহণ করিয়াছিলেন তিনি। সামান্য সম্বল ভাঙ্গিয়া নিত্যকার খরচ যোগানো, সরজিতের পড়িবার খরচ চালাইয়া যাওয়া......সেই সঞ্চিত সম্বল যতই ক্ষীণ হইয়া আসিতেছিল ততই তাঁর ভয়-ভাবনা ও প্রকৃতির অসহিষ্ণুতা বাড়িতেছিল।

*

* *

কলেজে যাইবার জন্য আয়নার সামনে দাঁড়াইয়া সরজিৎ চুল আঁচড়াইতেছিল। বিজয়া ঘরে ঢুকিতে ঢুকিতে চৌকাটে হোঁচট খাইয়া একটুখানি দাঁড়াইয়া কহিল, "উঃ, পায়ে যা জোর লেগেচে!"

অপরপক্ষ হইতে কেহ সাড়া দিলনা। সরজিৎ চুলের উপর তেমনই সজোরে ব্রাশ ঘষিতে লাগিল।

কিছুক্ষণ পরে জিজ্ঞাসা করিল, "আজ আবার মায়ের সঙ্গে কী কাণ্ড বাধিয়েছিলে? আমি রান্নাঘরে খেতে গিয়েছিলেম, মা বলতে লাগলেন, তারপরে চোখে আঁচল চাপা দিলেন। আমি বেগতিক দেখে উঠে পালিয়ে এলেম।"

বিজয়া ধীরে ধীরে আসিয়া খাটের উপর বসিল। তাহার নিঃশ্বাস প্রশ্বাস ঘন ঘন বহিতে লাগিল, চোখ ছল্‌ছল্‌ করিয়া উঠিল, বলিল, "এত কথা কে জানত, আমি তোমার জন্যে ডিমের চপ্‌ ভাজছিলেম, সেই হাতে ভাঁড়ারে ঢুকে একটা হাঁড়িতে চিনি আর এলাচ খুঁজছিলেম, চপে লাগবে বলে। এতেই তোমার মা অসম্ভব রেগে গেলেন, বললেন, ভাঁড়ারের যা কিছু

জিনিষপত্র সব তাঁকে ফেলে দিতে হবে। আমি বুঝতে পারিনে, এত সামান্ত কারণে মানুষে এত রেগে ওঠে কেন?"

বিজয়ার ছল্‌ছল্‌ চোখের দিকে চাহিয়া সরজিতের মনে কষ্ট হইল। সে সরিয়া আসিয়া তাহার মাথার উপর একটা হাত রাখিয়া দাঁড়াইল।

তখন কলিকাতার জনস্রোত উদ্দাম হইয়া উঠিয়াছে, ঘড়িতে দশটা বাজে। স্কুলের কলেজের ছেলেদের, অফিসের বাবুদের দল মহা ব্যস্তভাবে বাসে ট্রামে চড়িয়া গন্তব্যস্থানের দিকে ছুটিয়াছে। বাহিরের রৌদ্রখচিত কর্ম্মচঞ্চল ঐ দিকটায় চাহিয়া সরজিৎ কিছুকাল চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার পরে মৃদুস্বরে কহিল, "ওসব রান্না-বান্নার হাঙ্গামের মধ্যে তুমি কেন যাও, বিজয়া? ওসব তো কোনকালে তোমার অভ্যাস নেই, এমনি থাকলেই পার। তাহলেই মায়ের সঙ্গে গোলমাল বাধবার আর কোন ভয় থাকেনা। আমার ল'য়ের শেষ পরীক্ষা দেওয়ার এখনও বছর-খানেক দেরী, এই একটা বছর কোন রকম করে চালিয়ে নিতেই হবে, তারপরে জীবনের যুদ্ধে একবার আমি মুখোমুখি নেমে দেখব।"

বিজয়া সেলায়ের কলে পুরোণ কাপড় সেলাই করে, নিজের হাতে চায়ের পেয়ালা ধোয়, তার পূর্ব্বতন পিতৃগৃহের তুলনায় এসকল কাজ খুবই বেশি সন্দেহ নাই, তবুও একটা সংসার পুরাপুরি চালাইবার সে কিই-বা জানে। একটা ঠিকা ঝি আছে,

বাসন-মাজা, মশলা-পেষা, কাপড়-কাচা, ঘর-দুয়ার ঝাঁট দেওয়া —এদিককার মোটামুটি কাজগুলা সমস্ত করিয়া দেয়, বাকী কাজ শাশুড়ি করেন। সেইদিন তাঁহার সহিত গোলমাল হইয়া যাইবার পর হইতে আর সে সেদিক দিয়া যায়না।

দিনগুলি একরকম কাটিয়া যাইতেছে। সরজিতের সঙ্গে গল্প করিয়া তাহার ছোটখাট কাজগুলি করিয়া দিন কাটে। একটা জিনিষ কিন্তু সে বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিতেছে, তাহার স্বামী দিন দিন কেমন করিয়া অত্যন্ত গম্ভীর হইয়া যাইতেছে। ভোর পাঁচটার সময় একদিন হঠাৎ তার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল, চাহিয়া দেখিল, স্বামী পাশে শুইয়া নাই—একটু বিস্মিত হইল। উঠিয়া লঘুপদসঞ্চারে পর্দ্দার আড়াল হইতে দেখিল, পড়িবার ঘরে সরজিৎ ধ্যানমগ্নের মত একরাশি বইয়ের মধ্যে ডুবিয়া আছে। যেন তাহার বাহ্যজ্ঞানঅবধি নাই। ঐগুলি কি আইনের বই? কাছে যাইয়া ভালো করিয়া দেখিতে ইচ্ছা করে, কিন্তু আবার মনে হয়, একজন লোক অমন ধ্যানস্থ হইয়া পড়িতেছে, তাহার ধ্যান ভাঙ্গিয়া কী লাভ।

সকালবেলায় বিজয়া দেখিল, তাহার শাশুড়ির খুব জ্বর আসিয়াছে। জ্বরের ধমকে তিনি বিছানা হইতে উঠিতে পারিতেছেননা। তাঁহার কাছে ভাঁড়ারের চাবি চাহিয়া লইয়া এদিককার একটা ব্যবস্থা করিয়া দিবার জন্ত সে উঠিয়া আসিল। বিপদের উপর বিপদ। ঠিকা ঝি দাসীর মা, সে'ও আসে নাই।

অন্যদিন ভোর পাঁচটা বাজিতে-না-বাজিতে আসিয়া কাজকর্ম্ম সুরু করে, আজ আটটা বাজিতে যায়, এখনও দেখা নাই।

কি যে সে করিবে, কিছুই ভাবিয়া পায়না। কেমন করিয়া কয়লা ভাঙ্গিবে, কেমন করিয়া উনুন ধরাইবে, কলতলায় রাত্রির বাসন এখনও রাশীকৃত হইয়া পড়িয়া আছে।

সরজিৎ তাহার পড়ার ফাঁকে কোন এক সময়ে নিরুদ্বিগ্নচিত্তে আসিয়া বলিয়া গেল, "অত ব্যস্ত হবার কিছুই নেই বিজয়া, আমি দোকান থেকে কিছু খেয়ে নিয়ে কলেজ যাব। তোমার জন্যে বলতো হোটেল থেকে খাবার আনাবার বন্দোবস্ত করে দিয়ে যাই। দেখি এ-বেলা যদি দাসীর মা না আসে, ও-বেলাতে আর একটা লোক খুঁজে আনবার বন্দোবস্ত করব।"

বিজয়া রান্নাঘরের দরজায় একটা হাত রাখিয়া চিত্রার্পিতের মত দাঁড়াইয়া রহিল। সরজিৎ তাহাকে বকে নাই, বরঞ্চ মিষ্ট-ভাষায় তাহার কর্ম্মতালিকা সোজা করিয়া দিয়া গেল, তথাপি অভিমানে তাহার দুই চক্ষু জলে ভরিয়া আসিল।

আমি কোথায় কি-অভ্যাসে মানুষ হইয়াছি, উনি কি জানেন-না সে-কথা? তাই আজ জানিয়া-শুনিয়া অপমান করিয়া গেলেন। আমি কি জীবনে কখন বাসন মাজিয়াছি না রান্না করিয়াছি যে আজ সেই সমস্ত কাজ অনায়াসে করিতে পারিব! এটা জানিয়াও উনি এমন সুরে কথা বলিলেন যে আমি জানিয়া-

শুনিয়াও কেবল কুঁড়েমির জন্য কিছুই না করিয়া চুপ্‌চাপ্‌ বসিয়া আছি।

ষ্টোভ ধরাইয়া তাহাতে খানিকটা দুধ গরম করিতে বসাইয়া সে শ্বাশুড়ির ঘরে আসিল, "মা কেমন আছেন এখন? কিছু খাবেন? একটু গরম দুধ?......"

কোন উত্তর আসিলনা। গায়ে হাত দিয়া দেখিল, গা যেন পুড়িয়া যাইতেছে! তাহাকে এমনই অবস্থায় একা ফেলিয়া সরজিৎ দিব্য নিশ্চিন্তমনে কলেজ চলিয়া গেল। কী যে করিবে, ভাবিয়া ভয়ে বিজয়ার হাত পা ঠাণ্ডা হইয়া আসিল।

পাশের ঘরে একটা ভালোমত বিছানা করিয়া তাঁহাকে শোওয়ান দরকার। মেঝেতে একটামাত্র মাদুর পাতিয়া তিনি শুইয়া আছেন, তাহার উপর জ্বরের ঘোরে অচৈতন্য।

বাইরে জুতার আওয়াজ পাওয়া গেল, পরমুহূর্তে সরজিৎ ঘরে আসিয়া ঢুকিল। তাহার হাতে রুমালে-ঢাকা কি কতকগুলা খাদ্যদ্রব্য। তাহাকে দেখিবামাত্র বিজয়ার অভিমানের স্রোত উচ্ছলিত হইয়া উঠিল, "কেন তুমি চলে গেলে? কে তোমাকে চলে যেতে বললে আমাকে এমনই একলা ফেলে রেখে! খাবার আনতে যাওয়ার কী দরকার পড়েছিল? আমি কি না-খেতে-পেয়ে মরে যাচ্ছিলেম?"

বিজয়ার এমনই সব অভিমানের মুহূর্তে, একান্ত নির্ভরের মুহূর্তে, সরজিৎ তাহাকে পাইয়া চরিতার্থ হইয়া যায়। মনে মনে

অত্যন্ত একটা সুখের সহিত বেদনা বোধ হইতে থাকে, এ কেন আমার জীবনের সঙ্গে এমন করিয়া জড়াইয়া গেল! এখনও কত দুঃখ কত অন্ধকারের কাহিনী বাকী আছে না-জানি, সে সমস্তই আমার সঙ্গে একেও সহ্য করিতে হইবে।

খাবারের পাত্রটা নামাইয়া রাখিয়া সরজিৎ সস্নেহকণ্ঠে কহিল, "কেন অত ভয় পাচ্ছ, বিজয়া! মা'র জ্বরটা একটু বেশি হয়েচে বইতো নয়। সহরে এখন ভারি ইনফ্লুয়েঞ্জা হচ্চে, তাই হবে বোধকরি। আমি যাচ্ছি গলির মোড় থেকে ডাক্তার ডেকে আনতে, তুমি ব্যস্ত হয়ে পড়োনা যেন।"

ডাক্তার আসিলেন, বুক-পিঠ পরীক্ষা করিয়া মুখ বিকৃত করিয়া কহিলেন, "বুকে সর্দ্দি বসেচে, খুব সাবধানে রাখতে হবে।"

সেবা-শুশ্রূষা সম্বন্ধে বারবার সতর্ক থাকিতে বলিয়া গেলেন। বিজয়ার অপটু-হাতে সংসার প্রায় অচল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সরজিৎ একটা উড়ে-বামুন একটা পশ্চিমা-চাকর খুঁজিয়া পাতিয়া জুটাইয়া আনিল।

সন্ধ্যার দিকে ষ্টোভ ধরাইয়া মায়ের বুকে বাঁধিবার জন্য এ্যান্টিফ্লোজিষ্টিন গরম করিতে করিতে বিজয়াকে লক্ষ্য করিয়া সে একটু বিরক্তির সুরেই বলিল, "তুমি এসব পারবেই বা কি করে, যে ষ্টাইলে মানুষ হয়েচ! এই কথাই তো তোমাকে কতবার আগে আমি বলেছিলাম বিজয়া, যে তোমার কষ্ট হবে। শুনলেনা, এখন মজা ভোগো! কোথায় আই-সি-এস স্বামীর হাতে পড়ে

চাপরাশি দরওয়ানের ওপর হুকুম চালাতে, আর এ-কোথায় রাঁধতে হচ্চে, ঘর-ঝাঁট দিতে হচ্চে !"

বিজয়া রাগ করিতে গিয়া স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া হাসিয়া ফেলিল, বলিল, "তা হোক, তবুও আমি যেমনটি পেয়েচি, এমন আর কেউ পায়নি।"

"আহা, কী পেয়েচ, সেই যে রবিবাবুর কবিতায় রয়েচে, 'এমনটি আর পড়িলনা চোখে আমার যেমন আছে।' তুমিও এখন তাই বলে মনকে সান্ত্বনা দাও।"

"ত্যাখো, আমাকে বেশি রাগিওনা বলচি। যা কোরচ কর।"

সরজিৎ হাসিয়া আবার ষ্টোভটায় পাম্প করিতে থাকে।

*

* *

বিজয়ার মা সরোজিনী দেবী দু'দিনের জন্য জুড়াইতে বোনের কাছে গিয়াছিলেন, বোন তাঁহাকে অত্যন্ত সমাদর করিয়া গ্রহণ করিল। তাঁহার ছোট-বোনের নাম সুকেশিনী। স্বামী লাট-দপ্তরে বড় ওজনের চাকুরি করেন, ছ'মাস কলিকাতা, ছ'মাস সিমলা থাকেন। কাশ্মীরে হাওয়া খাইতে আসিয়াছিলেন। এখানে আসিয়া ভালো জল হাওয়া ও প্রাকৃতিক দৃশ্যের গুণে সরোজিনী

দেবীর ভাঙ্গা-মন জোড়া লাগিল, আস্তে-আস্তে চোখ মেলিয়া চারিদিকে দেখিতে লাগিলেন। তখন মনে একটা ব্যথা খচ্‌খচ্‌ করিয়া লাগিতে লাগিল, তাড়াতাড়ি বিজয়া কি একটা কাণ্ড করিয়া বসিল। একবার ভাবিলনা, হু'দিন দেরী সহিলনা, মেয়েটা তাড়াতাড়ি অশ্বভক্ষধনুর্গুণ কলেজের একটা ছেলের গলায় মালা দিয়া বসিল! বিয়ে কি পালাইয়া যাইতেছিল! তাঁহার এ অনুশোচনা শতগুণ বাড়িয়া গেল এই বাড়ীর মেয়ে বেবীকে দেখিয়া। আঠারো উনিশবছরের একমাত্র মেয়ে, নাম বেবী—বাপের আদরের নয়নের মণি, বাড়ীর সর্ব্বেসর্ব্বা। তাহার উপযুক্ত বর তাহার মায়ের কিছুতেই মনে ধরেনা, তবুও একজনকে মনে ধরিলেও ধরিতে পারে—সেই আয়োজনই চলিতেছে। ছেলেটির নাম কি বলিল, কুমারকান্তি। কুমারের মতই চেহারা। পূর্ব্ববঙ্গের ঐদিককার মস্ত বড়লোক, কলিকাতায় থাকে, বেবীকে দেখিয়া ভারী পছন্দ হইয়াছে তাই, সেই কুমারসাহেব কাশ্মীর অবধি ধাওয়া করিয়া আসিয়াছেন, মস্ত বড় এক বাড়ী ভাড়া লইয়াছেন। বেবী-মেয়েটার এদিকে কেমন আহ্লাদে-আহ্লাদে ধরণ হইলেও মেয়েটি বাপ মায়ের বাধ্য। এই দেখনা এত বড় মেয়ে, এখনও মা যে-কাপড়টি যে-জামাটি দেখাইয়া দেন তাই পরে। সর্ব্বদাই কেমন সাজিয়া গুজিয়া আছে। কিন্তু যতই সাজিয়া থাক, বিজয়ার কাছে-কি সে দাঁড়াইতে পারে! বিজয়ার মত ভালো দেখিতে ক'টা মেয়েই

যা আছে! সেই বিজয়া, সে যদি বেবীর মত মায়ের কথা শুনিয়া তাঁর একান্ত অনুগতভাবে চলিত, তিনি কি তার একটা হিল্লে করিয়া দিতে পারিতেননা! অবাধ্য একগুঁয়ে মেয়ে, বরাবর নিজের খেয়ালে চলে। তাঁহার কপালটাই খুব খারাপ, তা নইলে অমন স্বামী হঠাৎ অমন করিয়া মারাই বা গেলেন কেন! মেয়ে সাত-তাড়াতাড়ি এক কাণ্ড করিয়া বসিল, ছেলেগুলোর একটাও না-হইল মানুষের মধ্যে না-থাকিল তাহাদের কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান।

আর এখানে থাকিতে তাঁহার মন লাগিতেছেনা। বেবীর সাজসজ্জা সুখ-সৌভাগ্য যতই দেখিতেছেন ততই সেই অবাধ্য দুর্ব্বিনীত বিজয়ার জন্য তাঁর মন মাথা কুটিয়া মরিতেছে।

একসময়ে তিনি বলিয়া বসিলেন, "এইবারে আমি ক'লকাতায় ফিরি ভাই। অনেকদিন এসেচি, ছেলেমেয়েরাও হয়ত ভাবচে খুব।"

আদুরে-মেয়ে বেবী তাড়াতাড়ি আসিয়া তাঁহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া কহিল, "সে কি করে হবে মাসীমা, এখন তোমার যাওয়া চ'লবেনা। বারে! কাল আমার জন্মদিন, না? সেকথা ভুলেই বসে রয়েচ। তার পরদিন কুমারবাবু পিক্‌নিকের আয়োজন করেচেন, তুমি চলে যাবে, তাঁর মনে দুঃখ হবেনা বুঝি?"

এমনই আদর-আব্দারে আরও দিন-পনের কাটিয়া গেল, তারপরে সকলের সঙ্গে সরোজিনী একদিন কলিকাতা যাত্রা

করিলেন। তাঁহার ভগ্নিপতি তিনমাসের জন্য ছুটি লইয়া সঙ্গে যাইতেছেন। সুকেশিনী কারণটা সুস্পষ্ট করিয়া বলিয়া দিলেন, "ছেলেটি আর অপেক্ষা করতে পারেনা, এই সাম্‌নের মাসেই বেবীর সঙ্গে ওর বিয়েটা চুকিয়ে দেব, দিয়ে তারপরে নিশ্চিন্তি।"

অনেকদিন বিজয়াকে দেখেন নাই, সরোজিনীর অত্যন্ত ইচ্ছা হইতে লাগিল, একবার তাহাকে দেখি, তাহার অবাধ্যতার জন্য তাহাকে বকি। একখানা চিঠিতে তাহাকে আসিবার জন্য লিখিলেন, অনুনয় করিয়া। বাড়ীর পুরোণ দরওয়ান রামশরণকে দিয়া চিঠিটা পাঠাইয়া দিলেন। পাঠাইয়া দিয়া অবধি একপ্রকার সচকিত অবস্থায় তাঁহার সময় কাটিতে লাগিল। একেকটা গাড়ীর শব্দ হয় আর তিনি চমকিয়া ওঠেন, ঐ বুঝি বিজয়া আসিতেছে। নরেন, সুরেনের কাণ্ডকারখানা দেখিয়া তিনি চলিয়া যাইবার সময় নিজের মহালটা চাবি দিয়া বন্ধ করিয়া গিয়াছিলেন, এখন সেই ঘরগুলি খুলিয়া সারাদিন ধরিয়া তাহা সাজাইলেন, আলমারি খুলিয়া বিজয়ার পরিবার জন্য শাড়ি সেমিজ ব্লাউজ বাহির করিয়া সাজাইয়া রাখিলেন, এমন সময় রামশরণ আসিয়া খবর দিল, "মা, দিদিমণি তো আসতে পারলেননা। তাঁর শাশুড়ির ভারি অসুখ, গোটা সংসারটা একা তাঁকেই চালাতে হচ্ছে, তার উপরে ঐ অতবড় রুগী ফেলেই বা আসেন কেমন করে! তা তুমি মা একবারটি যেয়ে দেখে এসোনা। কত খুসী হবেন তাঁরা, তোমরা গেলে।"

*

* *

একটা উড়ে-ঠাকুর একটা চাকর রাখা হইয়াছে, ঝিটারও অসুখ সারিয়াছে, তথাপি সংসার ভালো করিয়া চলেনা। উনুন ধরিয়া উঠিয়াছে, হাঁড়িতে জল ফুটিয়া উঠিয়াছে এমন সময় আবিষ্কার হইল ডাল নাই, নুন নাই—ছোটাও বাজার! চাকরটা ঘর্ম্মাক্ত হইয়া যে-ই বাজার হইতে ফিরিয়া আসিল তখন আর একদফায় দেখা গেল, মশলা নাই, চিনি নাই, চা নাই! সরজিতের মায়ের হাতের গড়া সুনিয়ন্ত্রিত সুশৃঙ্খলিত গৃহস্থালী ভাঙ্গিয়া ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল।

টাকা এত খরচ হইতে লাগিল যে সরজিৎ ভাবিয়া কোনদিকে কূল-কিনারা পাইলনা। এমন করিয়া আর কিছুদিন চলিলেই মায়ের সামান্ত-সঞ্চিত-অর্থ নিঃশেষ হইতে দেরী লাগিবেনা। তারপর? তারপর যে কি হইবে সেকথা ভাবিতেও তাহার সাহস হয়না, কেবল সেই অতলস্পর্শী অন্ধকারে দুই চক্ষু মেলিয়া বসিয়া থাকা ছাড়া।

এদিকে মায়ের অসুখ দিন-দিন বাড়িয়া চলিয়াছে। একে বুড়ো-বয়েস, ডাক্তার বলিয়া গিয়াছেন, ডবল নিউমোনিয়া, এই বয়সে এ-টাল সাম্‌লাইলে হয়।

বিজয়া তাহার শাশুড়ির বুকে বাঁধিয়া দিবার জন্ত এ্যান্টিফ্লজি-ষ্টিনের টিনটা গরম করিতেছিল ষ্টোভ ধরাইয়া, বাইরে মোটর দাঁড়াইবার আওয়াজ হইল।

পরক্ষণে তাহার মা ঘরে ঢুকিলেন। পরণে সাদা-শিল্কের থান কাপড়, সাদা-রেসমের জামা। মুখের ভাবে, বেশে, ভঙ্গীতে যেন মুর্ত্তিমান আভিজাত্য। হাতে দামী প্ল্যাটিনামের রিষ্টওয়াচ, আঙ্গুলে হীরার আংটি, এ-ছাড়া আর কোন অলঙ্কারের চিহ্ন-মাত্র নাই। তিনি ঢুকিয়াই সামনে বিজয়াকে দেখিলেন, বারান্দায় বসিয়া ষ্টোভ ধরাইতেছে। মেয়ের মুখের দিকে তিনি সবিস্ময়ে চাহিলেন, এই কি সেই বিজয়া! মুখ শুক্‌নো, চুলগুলি রুক্ষ, রাত্রিজাগরণের ফলে শরীর শ্রীহীন! যে আধময়লা শাড়িখানি পরিয়া আছে তাহাতে দু'তিন জায়গায় সেলাইয়ের চিহ্ন।

মা আর মেয়ে দু'জনেই দু'জনের মুখের দিকে অবাক হইয়া চাহিল, দু'জনের চোখেই অবাক-ভাষা! দু'জনের মাঝখানে যেন একটা সমুদ্রের ব্যবধান। বিজয়াকে দেখিয়া তার মা ভাবিলেন, এই কি আমার সেই বিজয়া! দু'দিনে এমন বদলাইয়া গেল কেমন করিয়া! বিজয়া মাকে দেখিয়া মনে মনে ভাবিল, ঐ বিলাসিতা, ঐ স্বচ্ছন্দ-আনন্দে তাহারও একদিন কাটিয়াছে বটে কিন্তু ইহজীবনে আর কোনদিন কাটিবেনা—এখন আমি কতদূরে ভাসিয়া আসিয়াছি!

সরোজিনী নিজেকে কথঞ্চিৎ সামলাইয়া লইয়া মৃদুস্বরে

বলিলেন, "তোর চেহারা এমন হয়ে গেছে কেন মা? শুনলেম, তোর শাশুড়ির খুব অসুখ। বেয়ান এখন কেমন আছেন?"

"ভালো নেই। ঐদিকের ঘরটায় আছেন, চল যাই। তুমি এতদিন কোথায়-কোথায় বেড়ালে মা? কাশ্মীরে…"

হাতের কাজ শেষ করিয়া বিজয়া তাহার মায়ের সঙ্গে রোগিণীর ঘরে ঢুকিল। আসিবার সময় মাকে মোটরে তুলিয়া দিতে গেলে তিনি রুদ্ধস্বরে বলিলেন, "বিজয়া, তোর জীবন যে এমন হবে স্বপ্নেও কখনো ভাবিনি মা। তুই যেন জেনে-শুনে ইচ্ছে করে আত্মহত্যা করে বসলি। কিন্তু আর যাই করিস, এ-কথাটা যেন ভুলিসনি যে তোর মা এখনও বেঁচে রয়েচে, ইচ্ছে করলেই তুই তার কাছে গিয়ে দু'দণ্ড জুড়োতে পারিস।"

বিজয়ার হঠাৎ চক্ষু উথলাইয়া জল আসিল। সে মুখ নীচু করিয়া কোনক্রমে মায়ের কাছে নিজেকে লুকাইল। মোটরে ষ্টার্ট দিল, তাহার অশ্রুজলে-ঝাপসা-দৃষ্টির সম্মুখ দিয়া মোটর চলিয়া গেল। সেইখানেই বারান্দার একটা থামে ঠেশ দিয়া বিজয়া ভাবিতে লাগিল, এই কি তার আদর্শবাদের পরিণাম! এত আশা এত আদর্শ নিয়া যেপথে নামিয়াছিল, পা দিতে না-দিতেই সেখানে চারদিক হইতে এমন অন্ধকার আকুল হইয়া ঘিরিয়া আসিল!

সরজিৎ সকালে উঠিয়া ডাক্তারের কাছে গিয়াছিল, তিনি বাড়ী ছিলেননা, রোগী দেখিতে বাহির হইয়া গিয়াছেন।

বহুক্ষণ অপেক্ষার পরে বিরক্ত হইয়া ঘুরিয়া আসিয়া বাড়ীতে ঢুকিবামাত্র চাকরটা খবর দিল, একটা প্রকাণ্ড মোটর এইমাত্র আসিয়াছিল। তাহার অনুপস্থিতিতে ডাক্তার আসিয়াছিলেন মনে করিয়া সে ব্যগ্র হইয়া তাড়াতাড়ি তাহার মায়ের ঘরে গেল।

দেখিল তিনি একা আছেন, কাছে কেহই নাই।

"রামনিহোরা বলছিল, একখানা মোটর এসেছিল আমি যখন ছিলেমনা। কে এসেছিল, মা? ডাক্তারবাবু এসে কি তোমাকে দেখে গেলেন?"

"না, তোর শ্বাশুড়ি এসেছিলেন।"—কষ্টে পাশ ফিরিয়া মা বলিলেন।"

"তোমার ওষুধ খাওয়ানোর সময় হয়েছে। ওকি! তোমার ঐ বুকে দেবার ওষুধটা দেখচি ষ্টোভে চড়ান রয়েচে, বাটির জলটা সমস্ত শুকিয়ে পুড়ে উঠেচে! বিজয়া কোথায় গেল?"

স্ত্রীর খোঁজে আসিয়া দেখিল, বাহিরের বারান্দার থাম ধরিয়া বিজয়া দাঁড়াইয়া আছে, কাঁদিতেছে—চোখে তখনও অশ্রুবিন্দু। স্ত্রীর উপর সহানুভূতি হওয়া দূরে থাক, সরজিতের মন জ্বলিয়া উঠিল। তাহারও বড় দোষ নাই, ক্রমাগত রাত্রি-জাগা, দুর্ভাবনা, সংসারের এই দারুণ বিশৃঙ্খলা, মায়ের কঠিন অসুখ, একটা দিশেহারাভাব এই সমস্তগুলা মিলিয়া ভিতরে-ভিতরে তাহার ধৈর্য্যকে উৎপাটিত করিয়া আনিয়াছিল। কাছে আসিয়া কঠিন

স্বরে কহিল, "কান্না হচ্চে কেন, বিজয়া? তোমার মাকে দেখে বুঝি দুঃখের বাঁধ আর বাধা মানলোনা? মনে হয়ে গেল কী ছিলে আর কী হয়েচ! কিন্তু ওসব সখের কান্না রেখে আপাততঃ নিজের কর্ত্তব্যগুলো একটু মন দিয়ে করে যাও দেখি। ও-ঘরে মা একা পড়ে রয়েচেন, ষ্টোভে তাঁর ওষুধ চড়িয়েছিলে, সমস্তটা পুড়ে একাকার হবার যো হয়েচে।"

বিজয়া তীব্রদৃষ্টিতে স্বামীর মুখের দিকে একবার চাহিল, তাহাতে ছিল অবিমিশ্র ঘৃণা—"যাচ্ছি! আমার কর্ত্তব্যের কথা আর বক্তৃতা দিয়ে তোমাকে স্মরণ করিয়ে দিতে হবেনা। তুমি তোমার নিজের কর্ত্তব্য করে যাও দেখি, তাহলেই যথেষ্ট। যেমন স্বামীর হাতে পড়েচি, এখনই আমার কান্নার শেষ হয়েচে কি, এই তো সবে আরম্ভ!"

হতবুদ্ধি সরজিতকে আর কোন কথা বলিবার অবকাশ না দিয়া সে দ্রুতপদে চলিয়া গেল। একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া সরজিৎ ধীরে তাহার পাঠ-কক্ষে ঢুকিল, অনেকক্ষণ বসিয়া কি ভাবিল, তারপর দৃঢ়হস্তে একটা বই টানিয়া লইয়া পড়িতে লাগিল।

*

* *

"আর খরচের টাকা কিছুই নেই, কিছু টাকা দাও।"—বিজয়া তাহার স্বামীর ঘরে ঢুকিল।

"এই যে আশী টাকা দিন-সাতেক আগে দিলেম, এরই মধ্যে খরচ করে ফেললে ?"

সরজিৎ হাতের বইটা মুড়িয়া রাখিয়া স্ত্রীর পানে চাহিল। আজ একমাস হইল তার মা মারা গিয়াছেন। যে নির্ভরময় পক্ষপুটে তাহার আশ্রয় ছিল তা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। বিজয়া উদ্ধত-ভাবে কহিল, "সাতদিন আগে আশী টাকা দিয়েচ, সে কিসে কেমন করে খরচ হোল তোমাকে এখনই হিসেব দিতে হবে নাকি ? ঝকমারি আমার এমন ঘর-কন্নার !"

সরজিৎ শান্ত স্থিরকণ্ঠে কহিল, "তাহলে আমার মোট আয় কত, সেটাও তোমাকে এইবেলা জানিয়ে রাখি, বিজয়া। সব ছেড়ে, দু' জায়গায় ছেলে পড়িয়ে টাকা-চল্লিশেক পাই, এর বেশি আমার আয় আর একটি পয়সাও এখন নেই। বাড়ীটার ভাড়া লাগেনা, চল্লিশ টাকাতে যদি চালিয়ে নিতে না পার তাহলে কি করব আমি জানিনে। বলতো আরো টিউশনি জুটিয়ে নিতে পারি, কিন্তু

আরও ছেলে পড়িয়ে সময় নষ্ট করলে আমি যে পরীক্ষাটার জন্যে তৈরী হচ্ছি তা দিতে পারবোনা।"

বিজয়া বিস্ময়ে বিস্ফারিত হইয়া কহিল, "চল্লিশ টাকায় কোন ভদ্রলোকের সংসার চলে! তুমি কী বলচ?"

"আমি একটুও বাড়িয়ে বলচিনা বিজয়া। মার অসুখে প্রায় শো-দুই টাকা ধার হয়ে গেছে। তাঁর পুরোণ ভারি বালা-জোড়াটা আমি বেচে দিয়েচি, দিয়ে সে ধার শোধ করেচি। তোমাকে যে আশী টাকা দিয়েছিলেম সে ঐ গয়না-বেচা টাকা—ধার মিটিয়ে কিছু বেঁচে ছিল। এখন এই বাড়ীখানা ছাড়া আর মাসিক চল্লিশ টাকা আয় ছাড়া আমার সংসারে আর কিছুই নেই। বিশ্বাস করচনা? কিন্তু একবর্ণ বাড়িয়ে বলিনি, এখন কিছুদিন এতেই আমাকে চালিয়ে নিতে হবে।"

"উঃ! তুমি নিজের অবস্থা এমনি করে গোপন করে রেখেছিলে!"

"আমি কিছুই গোপন করিনি। তোমাকে বারংবার জানিয়েছিলেম আমার দৈন্যের কথা, তুমি কি-যেন একটা অসম্ভব জেদ করে বসেছিলে। কিন্তু অত ভয় পাচ্ছ কেন বিজয়া, পুরুষমানুষ আমি, আমি নিজে একদিন মাথা তুলে দাঁড়াবই। তুমি যদি আমার পাশে থাক, কোন বাধা কোন সংগ্রামকেই আমি ভয় করিনে। তুমি অমন করে হতাশ্বাস হয়ে পড়চ কেন?"

বিজয়া ভগ্নস্বরে কহিল, "আর আমার আশা করবার কি আছে। চল্লিশ টাকা! আমাদের ড্রাইভারের মাইনেই যে পঞ্চান্ন টাকা। আমি......"

সরজিৎ কঠিনকণ্ঠে ডাকিল, "বিজয়া! তুমি চুপ কর। তোমাকে চিনতে এতদিন পারিনি আজ যেমন করে পারলেম। তোমাদের আধুনিক মেয়েদের ঐ নাকিসুরের কান্নাকে আমি খুব ভালো করে চিনে নিয়েচি। তোমাদের জীবনে আদর্শ নেই, সংযম নেই, সহিষ্ণুতা নেই, আছে কেবল ষ্টাইল। অমুক ফ্যাশানের কোর্ত্তা চাই, সংসার চালাতে ঝি-চাকর-বামুন-ড্রাইভার বাবুর্চ্চি চাই, অমুক ফ্যাশানের অমুক জিনিষ চাই। যে স্বামী নির্ব্বিবাদে এসব জোগাতে পারবে তোমরা দয়া করে তার ঘর আলো করবে, তার ঘরে গ্রীসিয়ান-স্যাণ্ডাল পরে ঘুরে বেড়াবে, অনুগ্রহ করে চা-দানি থেকে তার জন্যে একপেয়ালা চা ঢেলে দেবে—এর চেয়ে বেশি এককড়ার যোগ্যতা তোমাদের নেই। কোন পুরুষের জীবনসঙ্গিনী তোমরা হতে পারবেনা, সুখে দুঃখে অবিচলিত থেকে তাকে সাহায্য করবার শক্তি কোথায় পাবে তোমরা?". ....

বিজয়া শ্লেষের হাসি হাসিয়া কহিল, "থাম থাম, তোমাকে অত বক্তৃতা দিতে হবেনা। তোমার মুখে অন্ততঃ ওসব বড় বড় কথা সাজেনা। যার যাসে........." কি একটা বলিতে গিয়া নিজেকে সামলাইয়া লইয়া কহিল, "থাক আর কথা কাটাকাটি

করতে আমার প্রবৃত্তি হয়না। মোট কথা এই যে, তুমি এখন আর টাকা দিতে পারবেনা সংসার খরচের জন্যে। দেখি, আমি যদি কিছু উপায় করতে পারি।"

সরজিৎ রুদ্ধস্বরে ডাকিল, "বিজয়া! এক সময়ে তো আমাকে ভালোবেসে সব বাধাবিঘ্ন তুচ্ছ করে আমারই ঘর করতে এসেছিলে। সে তো বেশিদিনের কথা নয়। এখনও কি ইচ্ছে করলে কিছুদিনের জন্যে আমাকে একটু শান্তি দিতে পারোনা? তোমাকে মিনতি করে বলচি, আমাকে কিছুদিন শান্তিতে কাজ করতে দাও। বিশ্বাস করো, আমি প্রতিমুহূর্ত্তে ভাবচি, তুমি যে আমার ঘরে এসেচ, তোমাকে কেমন করে সুখে রাখব। তোমার উপযুক্ত ষ্টাইলে কেমন করে তোমাকে আরামে স্বাচ্ছন্দ্যে রাখব। এর জন্যে আমার জীবন আমার সমস্ত শক্তি নিঃশেষ করতে আমি রাজী আছি, কিন্তু কি করে তা করব যদি শান্ত মনে কাজ করতে না পাই, যদি তুমি অহোরাত্রি কাণের কাছে এসে বলতে থাক, আমাদের ড্রাইভারের আয় তোমার চেয়ে বেশি! তোমার ছোটমুখে বড়-বড় কথা সাজেনা।—

তুমি কি মনে কর কেবল ল' পড়বার জন্যেই আমি দিবারাত্র অত পরিশ্রম করে থাকি? তা'নয়। আমি একটা প্রতিযোগিতা-মূলক পরীক্ষার জন্যে তৈরী হচ্ছি। ব্যাপারটা অর্থনীতি আর অঙ্কশাস্ত্রের। যদি পরীক্ষায় দাঁড়াতে পারি, মোটা-মাইনের চাকরি বাঁধা।"

মোটা-মাইনের চাক্‌রির চিন্তা শেষে সরজিতেরও জীবনের ধ্যান-জ্ঞান লক্ষ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বিজয়া ভাবিতে লাগিল, অথচ সে একসময়ে ইচ্ছা করিলেই তো মোটা-মাইনের চাক্‌রী আছে এমন যে-কোন লোককে বিবাহ করিতে পারিত। তাহা হইলে টাকাটাই দুনিয়ায় সব, আর যা-কিছু সবই মনের কল্পনা, বিলাসমাত্র। সে যাই হোক, তার স্বামী কেমন যেন একটু একগুঁয়ে প্রকৃতির, এ-কথা আর অস্বীকার করিবার যো নাই। এত ভালো করিয়া বি-এস-সি পাশ করিল, তখন বাবা কত সাহায্য করিতে চাহিলেন, তাঁহার সাহায্যেই না'হয় একবার য়ুরোপ ঘুরিয়া আসিতে পারিত! না না, তার কপালই ভাঙ্গা, তা'নইলে বাবা হঠাৎ অমন করিয়া মারা যাইবেন কেন! তিনি বাঁচিয়া থাকিলে বিজয়া মোটেই এত ভাবনায় পড়িতনা। আর ঐ যে কিসব পরীক্ষার কথা সরজিৎ বলিল, ওসব বিজয়া মোটেই বিশ্বাস করেনা। তার কপাল যদি ভালো হইত তবে ভগবান প্রথম হইতেই অন্যরূপ বিধান লিখিতেন।

*
* *

ঠিকা-ঝি আসিয়া বলিল, "মা, কয়লা নেই, উনুনে আঁচ দিতে পারলেমনা। আমাকে যদি পয়সা দাও আমি চট্ করে সামনের কয়লারডিপো থেকে কয়লা নিয়ে আসি।"

বাক্স খুলিয়া বিজয়া দেখিল কয়েক-আনা পয়সামাত্র পড়িয়া আছে, গুনিয়া দেখিল, সাড়ে-তিন আনা—লজ্জা! লজ্জা! সমস্ত সংসারে মাত্র সাড়ে-তিন আনা পয়সা ছাড়া তার সম্বল আর নাই। ঝিকে সে কি বলিবে এখন! স্বামীকে টাকা চাহিতে গিয়া অনেক বাদানুবাদ হইয়া গেল এইমাত্র। বাক্সের ডালাটা বন্ধ করিয়া ঝিয়ের কাছে গিয়া কহিল, "দেখ ঝি, আমার কাছে তো বাছা দশটাকার নোট ছাড়া আর ভাঙ্গানো-টাকা নেই। এই সন্ধ্যেবেলায় নোট ভাঙ্গাতে পারবে? তার চেয়ে কয়লা একমণ তুমি নিয়ে এস, আমি কাল সকালে দাম দিয়ে দোব।"

"তাই যাই মা। ডিপোওয়ালা ভালোমানুষ, আমাকে চেনে, বললেই দেবে।"

ঝি চলিয়া গেল, বিজয়া কি করিবে কিছুই ঠাহর করিতে পারিলনা। দেখিল, সরজিৎ সেই সন্ধ্যার প্রায়ান্ধকারে একটা

চাদর টানিয়া লইয়া শুষ্কমুখে বাহির হইয়া যাইতেছে। বিজয়ার বুকে ধ্বক্ করিয়া একটা ঘা লাগিল। এই তো মানুষটা সেই সাড়েন'টার সময় উড়ে-বামুনের রান্না আধসিদ্ধ ডাল আর পোড়া বেগুনভাজা দিয়া খাইয়া কলেজ চলিয়া গিয়াছিল! এতক্ষণ অবধি আর কিছুই মুখে দেয় নাই। চা খাইবার সময় হইয়াছিল, কিন্তু কয়লা ছিলনা বলিয়া উনুন ধরে নাই, চায়ের জলও চড়ান হয় নাই।

কাছে গিয়া তাহার চাদরের খুঁটটা চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "কোথা যাচ্ছ? কিছু খেয়ে যাওনা, আজ চা-শুদ্ধ্ খাওনি, তোমার মুখ যে একেবারে শুকিয়ে গেছে।"

সরজিৎ স্ত্রীর মুখের পানে চাহিল। ঐ তো মুখের প্রত্যেক রেখায় তারই জন্য অবিমিশ্র উদ্বেগ, চিন্তা! আস্তে আস্তে বলিল, "না, আমাকে এখুনি বেরুতে হবে, যাদের বাড়ী পড়াই তাদের বাড়ী আজ মাইনে পাবার কথা। দেখি, যেয়ে তাগাদা দিই, যদি দেয়। আর একটু পরে গেলে আজ তো আর পাবইনা, বলবে, আজ রাত্রি হয়ে গেছে মাষ্টারমশায়, আজ আর টাকা বার করতে নেই।"

সরজিৎ চলিয়া গেল। বিজয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়াছিল, ঝি কয়লা ভাঙ্গিয়া উনুনে আঁচ দিতেছিল। বিজয়া ডাকিতে লাগিল, "ও দাসীর মা, শোন একবার এইদিকে। দেখ, তোমার জানা-শোনা কোন স্যাক্‌রা আছে? একবার ডাকতে পারো কাল

সকালে ? আমার একজোড়া বালা বড্ডই সেকেলে প্যাটানের, ভাবচি, বদলিয়ে গড়তে দেব।"

কলিকাতার ঝি, যথেষ্ট চালাক-চতুর। সে বলিল, "জানবোনা কেন মা, কতগণ্ডা স্যাক্‌রাকে জানি। এই তো বোসেদের বাড়ীতে কাজ করি, তাদের বাড়ীর গিন্নী বড় কড়া লোক। তা গিন্নীকে লুকিয়ে তেনাদের বৌরা, মেয়েরা কত গয়না ভেঙ্গে আবার মনের মত ফ্যাশানের করে গড়ায়, আমিই স্যাক্‌রা ডেকে নিয়ে আসি। আনবো, কাল ঐ বল্লভ-স্যাক্‌রাকেই ডেকে আনব, ভারি বিশ্বেসী লোক। কিন্তু হ্যাঁ মা, একটা কথা বলি বাপু, কিছু মনে কোরনা যেন। আজ হাতে টাকা নেই, কাল আবার টাকা হবে, তাই বলে গায়ের গয়না বেচবে কেন মা ?"

লজ্জায় বিজয়ার মুখ সিঁদুর হইয়া উঠিল। সে কত কষ্টে হাতে টাকা না-থাকার এই কাহিনীটা ঝিয়ের কাছে গোপন করিতে চাহিয়াছিল, কয়লা আনিবার প্রসঙ্গে বলিয়াছিল, হাতে দশটাকার নোট আছে, সন্ধ্যাবেলায় ভাঙ্গাইবার সুবিধা হইবে কি ? তথাপি এই চতুরা দাসীর কাছে কিছুই অগোচর নাই !

সংক্ষেপে সে বলিল, "না, গয়না বিক্রি করব কেন, বদলিয়ে আবার গড়াব সেইজন্যেই তোমাকে ডেকে আনতে বলেচি স্যাক্‌রাকে। এখনো আলোগুলো জ্বালোনি কেন ঝি ? অন্ধকার হয়ে এসেচে যে।"

ঝি কেরোসিনের বোতলটা হাতে করিয়া বলিল, "ঐ যাঃ,

তেল নেই সেকথা মনেই ছিলনা। যাই মা, চট্ করে নিয়ে আসি।"

"দাঁড়াও ঝি, পয়সা নিয়ে যাও।" বিজয়া বাক্স খুলিয়া সাড়ে-তিন আনা পয়সার মধ্যে একটি দো-আনি বাহির করিয়া ঝিয়ের হাতে দিল।

যাইতে যাইতে দাসীর মা বলিল, "হ্যাঁ, একটা কথা তোমাকে বলতে ভুলেচি মা, তোমাদের সেই উড়ে-বামুনটার জ্বর এসেচে ভারি। এই কালীঘাটে-না-কোথা তার মাসীর বাড়ী আছে, সেইখেনেই রয়েচে। তার গেল-মাসের মাইনেটা অবিশ্যি-অবিশ্যি করে চেয়ে পাঠিয়েচে, সকালে তার ভাই আসবে তারই হাতে দিয়ো। আজ এবেলা তুমিই যা পারো দু'মুঠো ফুটিয়ে নাও মা।"

ঝি বোতল-হাতে তেল আনিতে যাইবামাত্র বাহিরে একটা মোটরগাড়ী দাঁড়াইবার আওয়াজ পাওয়া গেল। পরমুহূর্ত্তে তাহার মায়ের সহিত তাহারই বয়সী কে একটি অপরিচিতা সুন্দরী মেয়ে আসিয়া ঢুকিল।

"বিজয়া! বিজয়া কোথায়রে? ওমা, এই অন্ধকারে একা চুপ করে দাঁড়িয়ে আছিস, কেনরে?"

নবাগত মেয়েটি মিহিগলায় বলিল, "এখনও আলো জ্বালেননি কেন?" সুইচ টিপিবার জন্ত মেয়েটি দেওয়াল হাতড়াইয়া ফিরিতেছিল, বিজয়া অপ্রতিভকণ্ঠে কহিল, "আমাদের বাড়ী তো

ইলেক্‌ট্রিক-কনেক্‌সন নেই। এই যে আমি ঝিকে বলচি, এক্ষুণি আলো জ্বেলে দেবে। মা, তোমরা ততক্ষণ ও-ঘরে বসবে চলো।"

মিনিট-দশেক পরে একটা লণ্ঠন হাতে লইয়া ঘরে ঢুকিতেই তাহার মায়ের সঙ্গে যে মেয়েটি আসিয়াছে সে নমস্কার করিয়া কহিল, "আপনি কিছু মনে করেননি তো? বাস্তবিক কলকাতার কোন বাড়ীতে এখনও লাইট-কনেক্‌সন্ নেই, মনে করতেও যেন হাসি পায়। আপনি আমাকে চিনতে পারচেননা? আমি আপনার মাস্তুত বোন হই, আমার ডাক-নাম 'বেবী'। আমার গল্প মাসীমার কাছে নিশ্চয় শুনে থাকবেন।"

সরোজিনী কহিলেন, "বেবী রোজ জিদ করে, মাসীমা আমাকে একদিন বিজয়াদি'র বাড়ীতে নিয়ে চলো, তা আর হয়ে ওঠেনা। আজ কিছুতেই সঙ্গ ছাড়লেনা।"

বেবীর গল্প মায়ের মুখে বিজয়া অনেক শুনিয়াছে। এখন আলোতে তাহার রূপ, তাহার মহার্ঘ বেশভূষা, বসনের ছটা, ফ্যাশানের চমক দেখিয়া মনে মনে লজ্জিত হইল। মায়ের উপর একটু রাগ হইল, এমন বাড়ীতে এমন মেয়েকে সঙ্গে করিয়া কেনইবা তিনি আনিলেন!

ঝি আসিয়া দোরের কাছে দাঁড়াইয়াছিল, বলিল, "মা, উন্থন সেই কতক্ষণ-থেকে কামাই হতে লেগেচে। চায়ের জল করে

রেখেচি, চাল ধুয়ে রেখেচি, হাঁড়িতে জল ফুটচে, সবই তৈরী, তুমি এসে যদি কেবল একবার জলে চাল ক'টি ছেড়ে দাও।"

বিজয়া সন্ত্রস্ত হইয়া বলিল, "তুমি যাও ঝি। ব্যস্ত হবার কিছুই নেই, আমি যেয়ে সমস্ত ঠিক করে নিচ্চি।"

সরোজিনী মুখ গম্ভীর করিয়া বলিলেন, "বিজয়া, এসব কি শুনচি! তোমাকে কি শেষপর্য্যন্ত নিজে রান্না করতে হয় নাকি? এতটা আমি ভাবিনি।"

বিজয়া লজ্জিত হইয়া বলিল, "না না, আমাদের বামুনটার আজ হঠাৎ এবেলা জ্বর এসেচে।"

বেবী ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিল! "বামুন, কি বামুন? নিশ্চয় উড়িয়া-বামুন, তোমরা ঐ নোংরা উড়িয়া-বামুনের রান্না কেন খাও বিজয়াদি'? আমি বলি, তার চেয়ে বাবুর্চ্চি ঢের ভালো। হ'লোইবা মুসলমান, আর তাছাড়া কোন হাঙ্গাম নেই, সমস্ত নিজেরা করে নেবে। এই দেখনা, আমাদের বাড়ী যে বাবুর্চ্চি আছে, তাকে সকালবেলায় কি কি রান্না হবে তারই একটা লিষ্ট আর টাকা ফেলে দাও, দিয়ে নিশ্চিন্তি। সে নিজেই বাজার যাবে, মাংস ফল মাছ যা দরকার কিনে নিয়ে আসবে, তারপরে ঠিক সময়ে ঠিক খাবার তৈরী করে টেবিলে সাজিয়ে খবর দেবে।"

বাইরে জুতার শব্দ হইল। বিজয়া বুঝিতে পারিল, স্বামী ফিরিয়া আসিয়াছেন। চোখের উপর স্বামীর অভুক্ত, ক্ষুধাতুর

শুষ্ক মুখখানা একবার ভাসিয়া উঠিল। সে একেবারে উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, "মা, তোমরা একটু বসবে? আমি ওঁকে এক-পেয়ালা চা তৈরী করে দিয়ে আসি।"

বেবী হাসিয়া উঠিয়া কহিল, "আর আমাদের বুঝি চা খাওয়াবেনা বিজয়াদি'? একলা জামাইবাবুকেই খাওয়াবে? আলাপ করিয়ে দেবেনা জামাইবাবুর সঙ্গে?"

"বেশ তো, বেশ তো।"—বিজয়া চট্‌ করিয়া উঠিয়া পড়িল। আসিয়া দেখিল, সরজিৎ রান্নাঘরের বারান্দায় পায়চারি করিয়া বেড়াইতেছে।

"কী হ'লো?"

"আজও টাকা পেলেমনা বিজয়া। সামান্য ক'টা টাকার জন্যে কত অপমান সহ্য করতে হয় জানো? আমি একটু জিদ করে আজকেই মাইনেটা চাওয়াতে, ছাত্রটির দাদা এসে বললেন, 'আপনার যে দেখচি আর সবুর সয়না। এমনিতে আপনার সঙ্গে আমরা যথেষ্ট ভদ্রতা করে চলি। দেখুননা কেমন বাজার পড়েচে, ব্যবসার বাজারে চরম মন্দা। উকীল ডাক্তার ব্যবসাদার সবারই আয় অর্দ্ধেকের চেয়েও কমে গেল। ব্যাঙ্কের সুদ কত করে দিয়েচে জানেন মশায়? ছ'পার্সেণ্ট থেকে একেবারে সাড়ে-তিন পার্সেণ্ট! এখন একটি ছাত্রকে একঘণ্টা অঙ্ক কষিয়ে আপনারই কি মাসে-মাসে কুড়ি টাকা করে নেওয়া উচিত? বলুননা? আমরা কিছু বলিনে, যাই হোক, চোখের

সামনে যখন দেখচি, আপনার কাছে অঙ্ক কষে ছেলেটা পাশ করে যাচ্ছে, রেজাল্ট ভালো হচ্চে, তখন মরুক্‌গে, না'হয় দু' পয়সা বেশিই নিলেন। কিন্তু তাই বলে এইরকম ক্রমাগত কড়া পেয়াদার তাগাদা—আজই চাই মাইনে…… ‥আজই এক্ষুণি চাই……এসব কি মশায় ?' এমনই আরো কত কথা বললে, বিজয়া। আমার এত অপমান বোধ হচ্ছিল, এমন রাগ হচ্ছিল, ইচ্ছে করছিল তখনই মুখের উপর বলে দিয়ে আসি, আমার দ্বারা আর আপনাদের বাড়ীতে কাজ হবেনা, কিন্তু মনে পড়ে গেল টাকার জন্যে এর চেয়েও কত কড়া কথা তুমি আমাকে শুনিয়ে দিয়েচ কিছুক্ষণ আগে। তখন আর কিছু বলতে পারলেমনা। ভিজে-বেড়ালের মত আস্তে-আস্তে চলে এলেম। বাস্তবিক যারা গরীব, তারা কেন বিয়ে করে! আজ যদি আমি বিয়ে না করতেম আমাকে কি নিজের আত্মসম্মান এমনভাবে নষ্ট করতে হোত ?"

সরজিতের মুখ দেখিয়া বিজয়ার মনে যেটুকু করুণা জাগিয়াছিল তাহার শেষ কথাটায় তাহা নিমেষে ধূলিসাৎ হইয়া গেল।

সে কঠিনকণ্ঠে বলিল, "আর আমিই যেন বিয়ে করে জন্মের মত একেবারে উদ্ধার হয়ে গেছি, নয় ? বলতে তোমার লজ্জা করেনা ? কে তোমাকে বলেছিল ভিজে-বেড়ালের মত চলে আসতে ? স্বচ্ছন্দে চাকরি ছেড়ে দিয়ে চলে আসতে পারতে। পুরুষমানুষ হয়ে এসব বলতে তোমার লজ্জা করেনা ?"

"না, লজ্জা করেনা। কিন্তু তোমার সঙ্গে কথা বলতে ক্রমশঃ লজ্জা করচে। তুমি এত অল্পতেই রেগে ওঠ, কাণ্ডজ্ঞান থাকেনা কিছু। যা মুখে আসবে তাই বলে চলবে। কিন্তু এসব প্রহসন আর রোজ-রোজ নাটক থাক বিজয়া, আমিও আর পারিনে। তুমি এখন কিছুদিনের মত তোমার বাপের বাড়ী যেয়ে থাক...... আর আমিও......"

বিজয়া কান্না চাপিবার চেষ্টায় রুদ্ধস্বরে কহিল, "বেশ, সেসব পরের কথা পরে হবে। তুমি এখন অত জোরে চেঁচিয়ে ঝগড়া কোরনা, পাশের ঘরে আমার মা আর একজন বোন রয়েচেন, তাঁরা অল্পক্ষণের জন্মে বেড়াতে এসেচেন, শুনলে কি মনে করবেন!"

সরজিৎ চুপ করিয়া বারান্দায় মাটিতেই বসিয়া পড়িল। দাসী সমস্ত আয়োজন প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিল, বিজয়া চায়ের কেৎলিতে চা ভিজিতে দিয়া বলিল, "মা সেদিনও এসেছিলেন, তোমার সঙ্গে দেখা হয়নি। আজ তোমার একবার দেখা করা উচিত।"

"তোমার মা আমার সঙ্গে দেখা করতে মোটেই ব্যাকুল হয়ে ওঠেননি। ওসব বাজে কথা রেখে আমাকে খুব কড়া করে এক পেয়ালা চা চট্ করে তৈরী করে দাও দেখি লক্ষ্মীমেয়ের মত; আমার অনেক কাজ আছে।"

"কি কাজ, শুনি? বইয়ের উপর মুখ গুঁজে পড়বে তো?

ওতে কি রাজ্য-উদ্ধার হচ্চে? সংসারে ভদ্রতা বলেও কি একটা জিনিষ নেই? সেটাও ভুলে গেছ বা ভুলতে বসেচ?"

"ভুলিনি গো ভুলিনি, মনেই আছে। কিন্তু আগে তোমাদের ভদ্রসমাজের মিশবার উপযুক্ত হই, তবে তো ভদ্রতা কোরব। আমি এখন তোমাদের সমাজে অস্পৃশ্য, একথা তুমিই আমার চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েচ, বিজয়া। কি দেখিয়েচ জান? সংসারে মন নেই, হৃদয় নেই, আদর্শবাদ বলে কোন জিনিষ নেই—আছে ষ্টাইল। আমার সঙ্গে তোমার মিলন পৃথিবীর সুন্দরতম কাব্যের মত মধুর হতে পারত, কিন্তু হ'লোনা। তা ব্যর্থ হ'লো তার কারণ, আমার জীবনের ষ্টাইলের সঙ্গে তোমার জীবনের ষ্টাইল মিললোনা। এর জন্যে তুমি দুঃখে মরে যাচ্চ, কোন কথাই আর সহজমনে ভাবতে পারচনা, সহজ চোখে দেখতে পারচনা। আমি কিন্তু প্রতিজ্ঞা করেচি, তোমাকে সেই তোমার পূর্ব্বতন-জীবনের ষ্টাইল একদিন ফিরিয়ে দেবই—যেমন করে পারি। সেদিন তুমি আবার বয়, বাবুর্চ্চি রাখতে পারবে, মোটরে চড়তে পাবে, সেই সাধনাতেই ব্যাপৃত আছি, বুঝলে? আর সমস্ত বড় লক্ষ্য আমার জীবন থেকে মুছে গেছে।"

বেবী পিছন হইতে পা টিপিয়া-টিপিয়া আসিয়া উচ্চকণ্ঠে হাসিয়া উঠিল, "বাঃ বাঃ, জামাইবাবু যে দেখচি একটি মিনিটও দিদিকে ছেড়ে থাকতে পারেননা। দিদি যেই রান্নাঘরে চা করতে এসেচেন অমনি আপনিও বারান্দায় এসে গল্প জুড়েচেন, ওদিকে

আমরা একলা বসে আছি। আর বিজয়াদি'কেও আচ্ছা স্বার্থপর বলতে হয়, লুকিয়ে-লুকিয়ে আপনাকে একলা চা খাওয়াচ্ছে, আমাদের দিকে একবারও দৃক্‌পাত নেই।"

"সে কি কথা? আপনার দিদির নামে ও-অপবাদ শত্রুতেও দিতে পারবেনা। এইযে, নিন আপনার চায়ের পেয়ালা!" বিজয়ার হাত হইতে একপেয়ালা চা লইয়া সে বেবীর হাতে দিল এবং নিজের পেয়ালাটা হাতে লইয়াই উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, "আচ্ছা, আপনি ততক্ষণ আপনার দিদির সঙ্গে গল্পগুজব করুন, আমি উঠি, একটু কাজ আছে।" আর দ্বিতীয় কথামাত্র না বলিয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল এবং নিজের পড়িবার ঘরে চলিয়া গেল।

*

* *

সকালবেলায় বল্লভ-স্যাকরার হাতে বিজয়া একজোড়া হীরক-খচিত বালা বার করিয়া দিল। জিনিষটা দেখিবামাত্র তাহার মূল্য উপলব্ধি করিয়া লোভে বল্লভের দুই চক্ষু জ্বলিয়া উঠিল।

মাথার কাপড়টা একটু টানিয়া দিয়া বিজয়া কহিল, "এই জিনিষটা তোমাকে বেচে দিতে হবে বল্লভ। পুরোণ-আমলের

জিনিষ আর পরতে ইচ্ছে করেনা। কিন্তু দেখ, কাজটা একটু গোপনে করবে, যেন বাবু টের না পান। এর উদ্দেশ্য আর কিছুই নয়, তিনি গয়না-টয়না গড়ানো বা নূতন করে তৈরী করা অতটা পছন্দ করেননা।"

বল্লভ মস্তক সঞ্চালন করিয়া জানাইল, সে বেশ বুঝিতে পারিয়াছে।"

"কিন্তু মা, এ যে হীরে-জড়োয়ার জিনিষ, এ বেচতে গেলেই যে বেশ লোকসান হবে। কেবল সোনা হ'লে, ওজন করেই বলে দিতুম কত আছে, কত দাম হবে।"

বিজয়া তাহার কথার উত্তর দিবার পূর্ব্বেই বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া দেখিল, সরজিৎ এই অসময়ে হঠাৎ বাড়ী ফিরিতেছে। এইমাত্র সে ছেলে পড়াইতে বাহির হইয়া গিয়াছিল, এসময়ে সে তো কখনই বাড়ী থাকেনা।

ঘরের বারান্দায় উঠিয়া সে থমকিয়া দাঁড়াইল। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে একবার স্ত্রীর দিকে একবার বল্লভ-স্যাক্‌রার পানে চাহিল। তাহার পরে স্যাক্‌রার হাত হইতে বালা-জোড়াটা লইয়া পকেটে রাখিল, বলিল, "তোমার নাম কি জানিনে, কিন্তু তুমি এখন যেতে পার। অনর্থক হয়তো তোমার কিছু হয়রানি হোল, তার জন্যে এই নাও কিছু পয়সা।" পকেট হইতে একটা আধুলি বাহির করিয়া সে বল্লভের হাতে দিল।

সে চলিয়া গেলে বিজয়ার দিকে ফিরিয়া কহিল, "এ তুমি কি

করছিলে, বিজয়া? এর তো কোন প্রয়োজন ছিলনা। তুমি কি মনে কর আমি নিশ্চিন্ত ছিলাম? এই নাও, দশটাকার এই চারখানা নোট ধর, একটু হিসেব করে খরচ কোর।”

অভিমানে বিজয়ার দুই চোখ ভরিয়া জল আসিয়াছিল, রুদ্ধস্বরে বলিল, “আমার চোখের সামনে তুমি না খেতে পেয়ে শুকোবে, চারিদিকে ধার হবে, পয়সার জন্যে গঞ্জনা, এসব আমি কি করে সহ্য করি বল? সেই জন্যে গয়না বিক্রী করতে গেছলেম। কাল রাত্রিতে মায়ের সামনেই সে কি অপমান! ঝি এসে বলে—চাল নেই, ডাল নেই, তেল নেই, উড়ে-ঠাকুরটার অসুখ হয়েচে। মা অবাক হয়ে বললেন, ‘বিজয়া, শেষে কি তোকে নিজের হাতেই রান্না করতে হয় নাকি?’ আমি কোন রকম করে কথা চাপা দিলেম। এ যে আমার কী মুস্কিল হয়েচে, সবারই কাছে প্রাণপণে ঢাকতে চাই, পারিনে।”

সরজিৎ একদৃষ্টে স্ত্রীর দিকে চাহিয়াছিল, এখন ধীরে ধীরে বলিল, “তোমার মা অবাক হতে পারেন, কিন্তু এতে অবাক হবারও কিছু নেই, লজ্জা পাবারও কিছুই নেই, বিজয়া। আমার মা যতদিন বেঁচেছিলেন, কখনো রান্নার জন্যে লোক রাখেননি, বরাবর নিজের হাতে রান্না করে বাবাকে, আমাদের খাইয়েচেন! এমন হয়েছিল যে কখনও বিপদে-আপদে একটা দিনের জন্যেও ঠাকুরের রান্না

আমরা সহ্য করতে পারতেমনা, মায়ের হাতে খেয়ে এমনই অভ্যেস হয়েছিল।"

বিজয়া জ্বলিয়া উঠিয়া বলিল, "তাহলে বলতে চাও, তোমার বাড়ীতে দু'টিবেলা আমাকে হাঁড়ি ঠেলতে হবে, আর কোন সুখ আর কোন উদ্দেশ্য আমার জীবনে নেই!"

সরজিৎ বলিল, "না, আমি কিছুই বলতে চাইনে। আমি কেবল তোমাকে একটি অনুরোধ করচি, তুমি কিছুদিন তোমার মা'র কাছে যেয়ে থাকোগে। তোমার কাছে আজ আর গোপন করবনা। আমি যে কেন এত দিবারাত্রি পরিশ্রম করচি জান? আই-সি-এস পরীক্ষা দেবার জন্যে তৈরী হচ্চি। এখান থেকে যদি ষ্ট্যাণ্ড করতে পারি তাহলেই চাকরী একরকম পাকা হয়ে গেল। দু'বছরের জন্যে ওরা ট্রেনিংয়ের খাতিরে বিলেত পাঠাবে, আমাকে কিছুই করতে হবেনা, সমস্ত খরচই ওদের। সামনের মাসের পনেরো তারিখে আমি পরীক্ষা দিতে যাব, তুমি এখন তোমার বাপের বাড়ী যেয়ে থাক। আমি বামুন চাকর সব ছাড়িয়ে দেব, ইক্‌মিক্‌কুকারে নিজের রান্না নিজেই করে নেব। আর যা সামান্য কাজকর্ম্ম থাকবে ঠিকা ঝি এসে দু'বেলা করে দিয়ে যাবে।"

বিজয়া অবিশ্বাসভরে মাথা নাড়িয়া কহিল, "এ-দেশে আই-সি-এস-এর কম্‌পীটিটিভ্‌ এগ্‌জামিনেশন (প্রতিযোগীতামূলক পরীক্ষা) দেওয়া ভারী কঠিন। সেকি তুমি পারবে? বড়দা,

মেজদা বিলেত থেকে অত ট্রেণিং নিলে অত চেষ্টা করলে কিছুতেই পারলেনা, তবেই-না শেষপর্য্যন্ত ব্যারিষ্টার হয়ে ফিরে এ'লো।”

“তোমার বড়দা মেজদা আর আমি একরকম না'ও হতে পারি।”

বিজয়া একটু শ্লেষের হাসি হাসিয়া কহিল, “নিজের শ্রেষ্ঠতার ধারণাটা মনের মধ্যে একেবারে পাকা করে গেঁথে নিয়েচ।”

“না বিজয়া, তা'নিইনি, কিন্তু সেই যে কথামালায় অনেককাল আগে একটা গল্প পড়েছিলেম, এক খরগোস এক ইঁদুরকে তাড়া করে—খরগোস সহজে হয়তো ইঁদুরের চেয়ে জোরেই চলে, কিন্তু এক্ষেত্রে নাকি ইঁদুরের প্রাণের দায় বড় দায় ছিল, তাই সে প্রাণপণে ছুটে চলে এগিয়ে যায়। তোমার বড়দা, মেজদা বুদ্ধিতে বিদ্যাতে আমার চেয়ে অনেক বড়, কিন্তু আমার মত প্রাণের দায় তাঁদের নেই, এই তফাৎ।”

বিজয়া অভিমানে নতমুখী হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। সরজিৎ তাহার আরও কাছে সরিয়া আসিয়া পকেট হইতে বালা দুইগাছি বাহির করিয়া বলিল, “তোমার এই জিনিষটি আমার কাছে রইল। আর একদিন আমি নিজে তোমার হাতে পরিয়ে দেব। আর একটা কথা, দেখ বিজয়া, তুমি অনর্থক রাগ বা অভিমান ক'রোনা। আমি অনেক আগেই বুঝেছিলেম, তোমার কোন দোষ নেই, আমারও দোষ নেই কোথাও, তবুও আমাদের বিবাহিত-জীবন ব্যর্থ হবে, অন্ততঃ প্রেম বা সহানুভূতির দিক থেকে।”

"কি তুমি বুঝেছিলে? কখন বুঝেছিলে? ওসব তোমার দম্ভ। কেন ব্যর্থ হোল'? তোমার নিজের কি কোন দোষই নেই ওতে?"

ঝি আসিয়া খবর দিল, উনানে আঁচ আসিয়াছে। বিজয়া উঠিয়া পড়িয়া কহিল, "ওসব অত সূক্ষ্ম আলোচনায় কাজ নেই। আমি চললেম, এখন হাঁড়ি চড়াতে হবে, নইলে কপালে উপোস, বুঝেচ?"

সরজিৎ হঠাৎ হাসিয়া ফেলিয়া কহিল, "খুব বুঝেচি, এখন দেখি একবার লক্ষ্মীর হাতের অমৃত খেয়ে।"

"হ্যাঁ, লক্ষ্মী না আরও কিছু! তুমি তো লক্ষ্মীকে বিদায় করতে পারলেই বাঁচ।"

বিজয়া কোমরে আঁচল জড়াইয়া মহোৎসাহে রান্নাঘরে ঢুকিল, যদিচ এসব ব্যাপারে তাহার অনভিজ্ঞতার সীমা নাই। দাসীর মা নিকটে দাঁড়াইয়া সমস্ত দেখাইয়া-শোনাইয়া দিতে লাগিল।

এত ঝগড়াঝাঁটি কথা কাটাকাটির পরেও বিজয়ার মনের নিভৃত অন্তস্তল দিয়া একটা মধুর স্রোত বহিতেছিল—নিজের হাতে রান্না করিয়া স্বামীকে খাওয়াইবে! একটা নূতন ধরণের মধুর উত্তেজনা।

জীবন-বিধাতার হাতে কত ভাঙ্গা-গড়ার লীলা চলিতেছে কে জানে?……হয়তো একদিন বিজয়া তাহার পূর্ব্বতন-জীবনের আলোক, সমারোহ, চাঞ্চল্য, ষ্টাইল সমস্তই ভুলিয়া যাইয়া উপকরণ-

হীন সামান্ত অনাড়ম্বর-জীবনের মাঝখানেও গভীর আনন্দের স্বাদ পাইতে পারিত, কিন্তু তাহার চোখের সুমুখে অহরহ বাপের বাড়ীর দৃষ্টান্তে তাহা আর হইতে পাইলনা।

সেদিন স্বামীকে খাওয়াইয়া নিজে খাইয়া সে চাকরটার জন্য ভাত বাড়িতেছে, এমন সময়ে বাহিরে মোটরগাড়ীর মুহুর্মুহু হর্ণ শোনা গেল। সদরের দরজাটা বন্ধ ছিল, চাকরটাকে ডাকিয়া খুলিয়া দিতে বলিল।

সঙ্গে সঙ্গে তাহার মা আসিয়া রান্নাঘরের দরজার কাছে দাঁড়াইলেন। সেদিন তাড়াতাড়িতে বিজয়ার চুল-বাঁধা হয় নাই, অনভ্যস্ত হাতে রাঁধিতে গিয়া কাপড়ে কালি ও হলুদের দাগ লাগিয়াছে, হাতে ভাত তরকারী লাগিয়া রহিয়াছে, ব্যস্ত হইয়া বলিল, "এ-ঘরে কেন এ'লে মা? যা ধোঁয়া, গরম, নোঙ্‌রা! ও-ঘরে ব'সবে চল।"

তাহার মা বিস্ফারিতচক্ষে চাহিয়াছিলেন, বলিলেন, "তুমি যদি এইখানে সকাল-থেকে এই বেলা বারোটা পর্য্যন্ত রান্না করে কাটাতে পেরে থাক বিজয়া, তবে আমি দু'মিনিট দাঁড়িয়ে থাকলে কিছু মরে যাবনা।"

হাত পা ধুইয়া কাপড় ছাড়িয়া বিজয়া এ-ঘরে আসিয়া দেখিল, তাহার মা একটা চেয়ারে অত্যন্ত গম্ভীর হইয়া বসিয়া আছেন।

বিজয়া ঘরে ঢুকিবামাত্র বলিলেন, "তোর এত কষ্ট আর আমি সহ্য করতে পারিনে বিজয়া, তুই না'হয় কিছুদিন আমার কাছে

যেয়ে থাকবি চল। নরেন, সুরেনের ব্যবহার তো নিজের চোখেই দেখেচিস, এখন তুই ছাড়া আর আমার নিজের বলতে কেউ নেই। তোর ভাবনা কিসের, তোর বাবা উইল করে রেখে গেচেন তোর রজনীকাকার কাছে। তিনি এতদিন ক'লকাতায় ছিলেননা, কাল ফিরে এসেচেন, এসেই উইল আমাকে দেখালেন। তোর বাবা মারা যাবার সময়ে নগদ টাকা কিছুই রেখে যেতে পারেননি বটে, কিন্তু ষাট-হাজার টাকার লাইফ-ইন্‌সিওর করে গেছেন। এ লাইফ-ইন্‌সিওর নাকি তিনি খুবই গোপনে করেছিলেন, তাঁর এক বন্ধু রজনীনাথ-এটর্নীর সঙ্গে পরামর্শ ক'রে। উইলে ও-টাকাটা কেবলমাত্র একলা আমাকেই দিয়ে গেচেন। এ ব্যাপার খুবই গোপনে করেচেন, তাঁর ইচ্ছা ছিলনা যে নরেন, সুরেন জানতে পারে বা এ-নিয়ে একটা গোলমাল বাধায়। তাই তোমার রজনীকাকাকে খুব গোপনে রাখতে বলেছিলেন এ-কথা। এখন আমি জানতে পারলেম, এখন আর ভাবনা কি! তুই আমার কাছে চল, জামাই একটা কিছু ভালো চাকরী-বাকরীর চেষ্টা দেখুক। ল' পড়চে, পাশ করে যদি বিলেত যেতে চায় ব্যারিষ্টার হতে বছরখানেকের জন্যে, যেতে পারে—আমি টাকা দেব।"

আশায় আনন্দে বিজয়ার মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

বলিল, "ওঁকে এ-কথা ব'লব, ফিরে আসুন। আচ্ছা মা, চল আমি এখন কিছুদিন তোমার কাছে যেয়েই থাকি। তোমাকে

দেখা শোনার লোক নেই, এই বয়সে এত বড় শোক পেলে, তার উপর দাদাদের এই তো ব্যবহার !"

"আমিও তো তাই বলচি। সরজিৎ এখন ছেলেমানুষ, তার উচিত এখন প্রাণপণে চেষ্টা করা কিসে দু'পয়সা রোজগার করতে পারে, কিসে উন্নতি হয়। উন্নতির এই বয়স পেরিয়ে গেলে আর কখনই উন্নতি করতে পারবেনা।"

মা ও মেয়েতে অনেকক্ষণ এই ধরণের সহানুভূতিসূচক কথাবার্ত্তা হইল, অবশেষে দু'জনেই অসংশয়ে একমত হইল যে, সরজিতকে প্রাণপণে ভাগ্যোন্নতির চেষ্টা করিতে হইবে। যে বিজয়ার মত স্ত্রী পাইয়াছে, তাহাকে কি চেষ্টা করিতে হইবেনা অমন স্ত্রীকে সুখে স্বচ্ছন্দে সম্মানে রাখিবার ?

বিজয়া অনেকখানি অভিমান, একটুখানি চোখের জল বর্ষণ করিয়া অতঃপর ইহাই স্থির করিল যে, যতদিন না স্বামী উপযুক্ত-রূপে তাহাকে সুখে রাখিতে পারিবেন ততদিন সে একাকী বাপের বাড়ীতে থাকিবে।

*

* *

রাত্রে সরজিতের কাছে বিজয়া কথাটা উত্থাপন করিল, "মা বলছিলেন, যা টাকা লাগে তিনি দেবেন, তুমি ল'পাশ করে ব্যারিষ্টার হয়ে এসনা !"

"কে বলছিলেন ?"

"মা। অত অবাক হচ্ছ কেন, মাকে উইল করে বাবা অনেক টাকা দিয়ে গেছেন।"

"বেশ তো, ভালোই করেচেন।"—সরজিৎ একটা বই খুলিয়া তাহাতে নিবিষ্ট হইয়া গেল। বিজয়া কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া অবশেষে উত্তেজিত হইয়া বলিল, "একটা জবাবও যে বড় দিলেনা ? এতই ছোট হোল তোমার কাছে কথাটা ? কেন, আমার মা আদর করে দিতে চান তোমাকে টাকা, তোমারই উন্নতির সাহায্য হবে বলে, অথচ তুমি কথাটায় কান পর্য্যন্ত দিচ্ছনা !"

সরজিৎ বইটা মুড়িয়া রাখিয়া স্থিরদৃষ্টিতে স্ত্রীর দিকে তাকাইয়া বলিল, "ওসব আলোচনা আমি করতে চাইনে বিজয়া। তোমার মা টাকা দিতে তৈরী থাকলেও আমি নিতে রাজী নই।"

"কেন নিতে রাজী নও ? আমার মা কি তোমার মা নন্ ?"

"না। তা যদি হতে পারতেন, আমিও অসঙ্কোচে নিতেম। তা যখন নয়, তখন আমি বলি ওসব আলোচনা থাক। তুমি তো জান, এমনিতেই তাঁর মনে রাতদিন অনুশোচনা হচ্চে।"

"কিসের জন্যে ?"

"তাঁর মেয়ে তাঁর কথা অগ্রাহ্য করে চাল-চুলোহীন এক অখ্যাত ব্যক্তিকে বিয়ে করে ব'সলো। তাঁর আফশোষ যথেষ্ট হচ্চে, আবার কেন সেটা বাড়াও ! আমার জন্যে একরাশ টাকা খরচ

করে শেষে হয়তো পস্তাবেন, আর তাঁর মনে কিছু হোক বা না হোক, আমি এ-টাকা নিতেই পারবোনা।”

বিজয়া কিছুক্ষণ মুখ গম্ভীর করিয়া বসিয়া রহিল, শেষে বলিল, “কিন্তু তুমি নাও বা নাই নাও, তুমি আমাকে যে-অবস্থায় রেখেচ এ-অবস্থায় আমি থাকতে পারবনা। আমি কালই চললেম।”

“তাই তো আমি আশা করেছিলেম, বিজয়া। তুমি যাও। কখনও যদি তোমাকে ষ্টাইলে রাখতে পারি, এস। আচ্ছা, তোমার যা বলবার ছিল শেষ হয়েচে কি ?”

বিজয়া বিদ্যুদ্বেগে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, “কেন, আমার সঙ্গে বেশিক্ষণ কথা বলতেও কি তোমার বড্ড কষ্ট হয় নাকি ? হ্যাঁ, শেষ হয়েচে, আমি যাচ্ছি।”

* * *

আজ সকালে আটটা বাজিতে-না-বাজিতেই বিজয়ার মা গাড়ী পাঠাইয়া দিয়াছেন। বিদায়ের আয়োজন করিতে করিতে বিজয়া বারংবার চক্ষু মুছিতেছে। একবার স্বামীর কাছে গিয়া কহিল, “হ্যাঁগো, সত্যিই কি বামুনটাকে ছাড়িয়ে দেবে নাকি ? তুমি নিজে রান্না করবে, সে যে তোমার ভারী কষ্ট হবে।”

সরজিৎ হাসিয়া বলিল, “কিচ্ছু কষ্ট হবেনা। কি করব জানো ? আটটার সময় ইক্‌মিক্‌কুকারে ভাত ডাল আর মাংস

কিংবা কোন একটা তরকারী চড়িয়ে দেব, তারপরে ঘড়ি দেখে ঠিক ন'টা সওয়া-ন'টার সময় নামিয়ে নেব, ব্যস্, হয়ে গেল। আর চা আমি খুব ভালো করেই করতে জানি। রাত্রিতে আর রান্না-বান্নার হাঙ্গাম করতে পারবনা, বাজার থেকে কিছু খাবার আনিয়ে নেব।"

বিজয়ার চক্ষু সজল হইয়া আসিতেছিল, অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া গোপন করিয়া কহিল, "কেন এত কষ্ট করবে, তার চেয়ে বামুন একটা রাখ, ঝি রইল, একরকম করে চলে যাবে।"

"আপাততঃ বামুন রাখবার মত পয়সা আমার নেই বিজয়া। কষ্ট হবে? তা হোক, কষ্টকে ভয় করবনা, আর কয়েকটা মাস নিজেকে এমনি করে চালিয়ে নিতেই হবে।"

বিজয়া ভালো করিয়া চাহিয়া দেখিল, তাহার স্বামীর মুখে দৃঢ়প্রতিজ্ঞার ব্যঞ্জনা। অনেক রাত্রি জাগিয়া সরজিতের মুখে একটা তীব্র শীর্ণ ছায়া পড়িয়াছে।

"তুমি মনে কিছু ক'রোনা বিজয়া। তুমি চলে যাচ্ছ বলে আমি বিন্দুমাত্র দুঃখিত নই, কিংবা এতে তোমার যে কোন অন্যায় হচ্চে তাও নয়। আমি নিজেই যে চাইছি যাতে খরচ কমে কয়েকমাস আমি আমার বর্ত্তমান-আয়েই চালিয়ে নিতে পারি। বরঞ্চ অন্যায় যদি কোন পক্ষে থাকে সে আমারই কেননা, বিয়ের পরেও স্ত্রীর খরচ না চালাতে পেরে তাকে বেশ-কিছুদিনের জন্যে বাপের বাড়ী পাঠাচ্ছি।"

বিজয়া মুখ ফিরাইয়া আকাশের মেঘের দিকে চাহিয়াছিল, মনে মনে অভিমান করিয়া ভাবিতে লাগিল, এই তো মোটে বছর-দেড়েক বিয়ে হইয়াছে, ইহারই মধ্যে সরজিতের কথার মতন কথা হইতেছে কেবল টাকার কথা, অবস্থার কথা, খরচ কমাইবার কথা। সংসারে আর কি কোন কথা নাই! নব-পরিণীতা পত্নীকে বহুদিনের জন্য বিদায় দিবার সময় আর একটা কথাও কি সরজিতের মনে পড়িলনা!

মোটর চলিয়া গেল। সরজিতের মুখে কোন ভাবান্তর দেখা গেলনা। সে একমনে যেমন বইয়ের পাতার উপর ঝুঁকিয়াছিল তেমনই থাকিল।

*

* *

বাপের বাড়ীতে বিজয়ার অভ্যর্থনা তার মা খুব ঘটা করিয়া করিলেন, বলিলেন, "দক্ষিণদিকের এই-সারির ঘরগুলো কাল থেকে তোর জন্যে ধুয়ে মুছে তৈরী করচি। এই একটা শোবার ঘর, একটা ব'সবার ঘর, স্নানের ঘর ঐ শোয়ার ঘরের পাশেই আর কোনের দিকের ঐ ছোট-ঘরটাতে খান-দুই আলমারি একটা ড্রেসিং-টেবিল আর একটা কাপড়ের আল্না

রাখিয়েচি, কাপড় ছাড়বি। আপাততঃ এই হ'লেই কোনো অসুবিধে হবেনা, কেমন ?"

"যথেষ্ট—যথেষ্টর চাইতেও বেশি।"

"জানিস, নরেন বিয়ে করচে যে এইমাসেই।"

"ওমা, তাই নাকি! কাকে ?"

"সেই যে বিভা বক্সী, মনে নেই ? অতুল মিত্রের শালী।"

"ওমা, সেই যে মোটা কালো-মত মেয়েটি! এত মেয়ে থাকতে দাদার পছন্দ হ'লো তাকে !"

"কী করবো। আমার নিজের একেবারেই পছন্দ নয়, কিন্তু কার কথা শোনে কে !" বিজয়া খানিকক্ষণ গম্ভীর হইয়া থাকিয়া বলিল, "দাদা বৌ নিয়ে এ'লে তার অনেকগুলো ঘর দরকার হবে। আমাকে তুমি দক্ষিণের ঘরগুলো দিয়ে দিলে, তারপরে জায়গার টানাটানি হবেনা তো ?"

"যদি তেমন হয়, আমরা নতুন বাড়ীতে উঠে যাব "

"নতুন বাড়ী আবার কোথা ?"

"উনি, তোর বাবা আমাকে একখানা বাড়ীও দিয়ে গেছেন যে উইলে। এখন ভাড়া খাটচে, আমি নোটিশ দিয়েচি ভাড়াটে উঠে যাবার জন্তে। কোথায় বাড়ীখানা জানিস ? খুব ভালো জায়গায়। তোর মাসীমা সুকেশিনীর বাড়ী সেই যে সেদিন তোকে নিয়ে গেছলেম, তারই বাড়ীর দু'তিনটে বাড়ীর পরে। ছোটখাট দোতলা বাড়ীটি, অনেকখানি কম্পাউণ্ড আছে।

ফুলের ঝোলানো টব, গেটে লতার গাছ, একেবারে সাজানো-গোজানো। তোর বাবার প্রকৃতি তো জানতিস, চিরদিনই চুপ্‌চাপ্‌। কাউকে কিছু বলেননি, আমার জন্যে কত ভেবেচেন, কত ব্যবস্থা করে রেখে গেছেন, অথচ কখনও মুখ ফুটে কিছু আলোচনা করেননি।"—এইখানে সরোজিনী দেবীর চোখ ছল্‌ছল্‌ হইয়া উঠিল।

একটু থামিয়া বলিতে লাগিলেন, "আর, তোকে তিনি কি ভালোটাই-না বাসতেন। তোর বিষয়ে সদা সজাগ-দৃষ্টি ছিল, এই সব বিষয় নিয়ে কতদিন আমার সঙ্গে মতান্তর হয়েচে।"

বাবুর্চি আসিয়া খবর দিল,—খানা প্রস্তুত।

"চল্‌ বিজয়া। তোর শাড়িখানা বদলাবি নাকি? মোটরে এসেছিস, হয়তো ধূলো লেগেচে। আমি এগিয়ে যাচ্ছি, তুই মুখ হাত ধুয়ে কাপড় বদলিয়ে আয়।"

বিজয়ার মন ভালো ছিলনা, কাপড় বদলাইতে একটুও ইচ্ছা ছিলনা। কিন্তু বাপের বাড়ীতে যখন আসিয়াছে তখন এখানকার ষ্টাইল বজায় রাখিয়া সে চলিবেই। কেহ যেন কোন কারণেই না বলিতে পারে, বিজয়ার দরিদ্রঘরে বিবাহ হইয়াছে বলিয়া সে অভিজাত-সমাজের কায়দা-কানুন সমস্তই ভুলিয়া গিয়াছে। তার উপর মায়ের কাছে খবর পাইয়াছে, আজ দুপুর-বেলায় বিভা বক্সী আসিবে, তাহাকে মধ্যাহ্ন-ভোজনের নিমন্ত্রণ করা হইয়াছে।

বাক্স খুলিয়া সে হাল্কা-রঙের শাড়ি ও ব্লাউজ বাহির করিয়া পরিল, পায়ে গ্রীসিয়ান-স্যাণ্ডাল পরিয়া, মাথার চুলে একটা এলো-খোঁপা বাঁধিল, সোনার সঙ্গে মীনার কাজকরা একটা লম্বা মফ্‌চেন গলায় পরিল, তারপর লঘুপদে ভোজনকক্ষের সম্মুখে উপস্থিত হইল।

আসিয়া দেখে, বিভা বক্সী আসিয়াছে, সঙ্গে তাহার বারো-তের বছরের একটি ভাই। নরেন এবং সুরেনও রীতিমত বেশভূষা করিয়া আসিয়া হাজির।

শুভ্র-আচ্ছাদন-পাতা খাওয়ার টেবিল ফুলের তোড়া দিয়া সাজানো। বয় ধীরে ধীরে এক-একপ্রকার খাদ্য সামগ্রী আনিতেছে, খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মৃদুস্বরে গল্পগুজব হইতেছে।

বিজয়া একটা চপ্‌ ভাঙ্গিয়া মুখে দিতেছিল, হঠাৎ তাহার মনে পড়িয়া গেল, স্বামী হয়তো এতক্ষণ নিজের হাতে রান্না-বান্না সারিতেছেন। কস্মিনকালেও কি নিজে কখনো রাঁধিয়াছেন! ইক্‌মিক্‌কুকারের রান্না হয়তো-বা সবটা সুসিদ্ধ হয় নাই। তাহার গলার মধ্যে যেন খাবার আট্‌কাইয়া যাইতে লাগিল। কি করিবে সে, কেন নিজের স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য সে এমন করিয়া বাপের বাড়ী পালাইয়া আসিল!......

বিভা তখন কৃত্রিম-রাগের সুরে সুরেনকে লক্ষ্য করিয়া মিহি-সুরে বলিতেছে, "তোমার দাদা কাল ইডেন-গার্ডেনে আমাকে

এমনই ভয় দেখালেন যে, মাগো, আমি তো সত্যি মনে করে · ..... ”

বিজয়ার দিকে চোখ পড়ায় বলিল, “মাপ করবেন, আপনার কি আজ শরীর খারাপ? কিছুই মোটে খেতে পারচেননা দেখচি।”

বিজয়া ভয়ানক অন্যমনস্ক হইয়াছিল, অত্যন্ত অপ্রতিভ হইয়া কহিল, “না, এই যে খাচ্চি।”

বিভা বক্রদৃষ্টিতে বিজয়াকে আদ্যোপান্ত দেখিতে লাগিল। নিজে সে দেখিতে বিশেষ সুশ্রী নয়, তাই এই সুন্দরীকে সে তেমন ভালো চোখে দেখিতে পারিলনা।

*

* *

বিভাকে নরেন বিবাহ করিয়া ঘরে-আনা-অবধিও তর সহিলনা। কাণ্ডটা ঘটিল তার পরের দিনই, যেদিন বিজয়া পিতৃগৃহে আসিল।

রাত্রি প্রায় একটার সময় নরেন বাড়ী ফিরিয়া দরজায় ধাক্কা দিতেছিল। বাবুর্চ্চি রাত্রিবেলায় নিজের বাড়ী চলিয়া যায়। চাকরটা ডাক শুনিতে পায় নাই, যখন শুনিতে পাইল তখন অনেকক্ষণ বিলম্ব হইয়া গিয়াছে। নরেন রুদ্ধদ্বারের বাহিরে

দাঁড়াইয়া তর্জ্জন গর্জ্জন করিতেছে শুনিতে পাইয়া সে শশব্যস্ত হইয়া দ্বার খুলিয়া দিল।

খুলিয়া দিবামাত্র—"ড্যাম্, নিগার, উল্লুক!" সম্ভাষণান্তে নরেন সজোরে তাহাকে এক ঘা মারিল। তারপর সশব্দে উপরে উঠিয়া আসিবার সময় সিঁড়ির মুখেই দেখিল, মা গম্ভীরমুখে দাঁড়াইয়া আছেন।

"রোজ-রোজ মাঝ-রাত্রিতে বাড়ী ফিরে এসে এসব কী কাণ্ড, নরেন?"

নরেন উদ্ধতস্বরে উত্তর করিল, "কাণ্ড আবার কি, বাড়ীতে এতগুলো লোক রয়েচ, দুয়োরটা ডাকবামাত্র খুলে দিতে পারনা? এই শীতের রাত্রিতে আমাকে ঠায় আধঘণ্টা বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতে হ'লো।"

সরোজিনী দেবী রাগিয়া উত্তর করিলেন, "না, কেউ শুনতে পাবেনা। তুমি ভদ্রঘরের সমস্ত রীতি উল্‌টিয়ে দিয়ে রোজ-রোজ মাঝ-রাত্রিতে বাড়ী ঢুকবে, কে তোমার জন্যে অপেক্ষা করে মাঝ-রাত্রি অবধি জেগে বসে থাকবে!"

নরেন ঠিক প্রকৃতিস্থ ছিলনা, বলিল, "যদি বসে থাকতে না পার তবে নিজের বাড়ীতে চলে যেয়ো। আমার বাড়ীতে আমার যা খুসী তা-ই করব।"

বিজয়ার নিজের ঘুমও ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। সে চোখ মুছিয়া মায়ের কাছে আসিল, ধরা-গলায় বলিল, "দু'টো দিন

বাবা যেতে-না-যেতে তোমার মুখের উপর এমন কথা বলতে দাদারা সাহস করে, তুমি কেমন করে সহ্য করো মা ?"

মা বলিলেন, "আমার সুখের কাহিনী ক্রমশঃ বুঝতে পারবি মা। এক-এক সময় মনটা হু হু করে ওঠে, তাই তো তোকে কাছে টেনে নিয়ে এলেম।"

পরের দিন জিনিষপত্র গোছানো সুরু হইল। মা তাঁহার বড় ছেলের দোর-গোড়ায় দাঁড়াইয়া বলিলেন, "নরেন, আমার বাড়ীর ভাড়াটিয়াদের নোটিশ দিয়েছি, খবর পেয়েছি তারা পরশু সকালে চলে যাবে। আজ হ'লো মঙ্গলবার, আমি শুক্রবারেই তা'হলে চলে যাব।"

নরেনের রাত্রিবেলাকার গোলাপী-নেশার জড়িমা তখনও ভালো করিয়া কাটে নাই, সে অস্পষ্ট জড়িত উচ্চারণে কি যে বলিল, বোঝা গেলনা।

মনের মধ্যে যতই অশান্তি থাক, বিজয়া অনেকদিন পরে আবার চিরাভ্যস্ত সেই আদর ও আরামের উষ্ণতায় সেই পরিচিত ষ্টাইলের মাঝে আসিয়া অত্যন্ত আরাম বোধ করিতেছিল—কোন শক্ত পরিশ্রম নাই, ভাবনা নাই, চিন্তা নাই।

সরোজিনী আসিয়া বলিলেন, "এই যে বিজয়া, তোর পুরোণ আয়াকে খবর দিয়েছিলেম, সে এসেচে। এখন থেকে সে তোর কাছে থাকবে, যা দরকার হাতে-হাতে করে দেবে।"

বিজয়া আপত্তি করিয়া বলিল, "আবার আমার একলার জন্যে আয়া কি হবে! অনর্থক শুধু শুধু..... "

মা জিদ করিয়া বলিলেন, "তা কি হয়, একজন আয়া নইলে চলবে কি করে? ও-বাড়ীর বেবীর জন্যে একজন আয়া আর একটা বয় একেবারে আলাদা করে আছে।"

বিজয়া সোফার উপর চক্ষু মুদ্রিত করিয়াছিল, আয়া চটি জুতা আনিয়া বলিল, "দিদিমণি, শুধু-পায়ে আছেন যে, পরুন।"

তাহার কাঁধে ফর্সা শুষ্ক তোয়ালে ছিল, তাহাই দিয়া সযত্নে পা মুছাইয়া চটি পরাইয়া দিল, চুলগুলি খুলিয়া ধীরে ধীরে চিরুণী দিয়া আঁচড়াইয়া দিতে দিতে জিজ্ঞাসা করিল, "দিদিমণি, স্নান করেন রোজ কখন? দশটার মধ্যেই করবেন কি? তাহলে আমি সব জোগাড় করে দিই।"

"দাওনা, আমি দশটার ভেতরেই স্নান সেরে নিই, বেশি বেলা করিনে।"

স্নানের ঘরে ঢুকিয়া বিজয়া দেখিল, বড়-বড় গামলায় গরম জল, ঠাণ্ডা জল, শুক্‌নো তোয়ালে, গামছা, সাবান দুই তিন রকমের; সর্ব্ববিধ উপকরণ সযত্নে সজ্জিত রহিয়াছে।

স্নান সারিয়া আসিতে আয়া তোয়ালে দিয়া ভিজা চুলগুলি আস্তে আস্তে আর একবার মুছাইয়া দিতে লাগিল।

দেখিতে দেখিতে শুক্রবার আসিয়া পড়িয়াছে, সেদিন বিজয়া মায়ের সঙ্গে নূতন বাড়ীতে উঠিয়া গেল। নরেন প্রকৃতিস্থ হইয়া

ক্ষমা চাহিয়াছিল, কিন্তু মা গম্ভীর হইয়া বলিলেন, "এ আমি আগে-থেকেই ঠিক করেছিলেম নরেন। তোমরা সকল রকমেই বিলেতী কায়দা-কানুনে জীবন তৈরী করেচ। বিলেতে বিয়ে হয়ে যাওয়ামাত্র ছেলে বৌ আলাদা করে সংসার পাতে, শ্বশুর-শাশুডির সঙ্গে তাদের সম্পর্কমাত্র থাকেনা। সেই রকমটিও যদি নকল করতে না পার তবে তোমাদের অশান্তির সীমা থাকবেনা। আমিও এই বুড়োবয়সে অনেক কষ্ট পেয়েচি, অশান্তির বোঝা আর কেন বাড়াই! আমি একটু নিরিবিলিতেই থাকতে চাই। বিজয়া এখন কিছুদিন আমার কাছে থাকবে, সেই আমাকে দেখবে শুনবে।"

তাহাদের এই নবপ্রতিষ্ঠিত গৃহস্থালীর বিজয়াই গৃহিণী হইল। যেদিন তাহারা নূতন বাড়ীতে আসিয়া পৌঁছিল, সেইদিনই বিকালে বেবী আর তার মা বেড়াইতে আসিলেন।

বেবী ছুটিয়া আসিয়া বিজয়ার গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "বাঃ, বিজয়াদি'—কী মজাই-না হয়েচে! তোমাদের বাড়ী থেকে আমাদের বাড়ী দু'মিনিটের রাস্তা। আমি রাতদিন আসব, তোমাকে জ্বালাতন করব। তুমি আমাকে ভাই সেদিন জামাই-বাবুর সঙ্গে ভালো করে আলাপ করিয়ে দিলেনা, আমি কিন্তু একজনের সঙ্গে তোমাকে আলাপ করিয়ে দেব। আমি সেদিন এসেই তাঁর কাছে তোমার গল্প করেছিলেম..... "

কৌতুকে বিজয়ার মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল, বলিল, "তাঁর

নাম কি, বললেনা-যে বড়? আমি বুঝব কেমন করে।.... না না, ঠাট্টা করেছিলেম। বুঝতে আমি আগেই পেরেচি। মাসীমার কাছে শুনেচি সব। তা কুমারকান্তিবাবুর সঙ্গে বিয়েটা তোমার কোন মাসে হবে? সামনের এই মাঘমাসেই, না? মস্ত একটা ভোজ অপেক্ষা করে রয়েচে। বেশ, তাঁর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়ো, সুখী হব।"

সেদিনটা গোলমালে কাটিয়া গেল। নূতন বাড়ী সাজানো গোছানো, মাসীমা-সুকেশিনী দেবী এ-পাড়ার সুবিধা অসুবিধা যাহা কিছু জ্ঞাতব্য তথ্য সমস্ত খুঁটাইয়া জানাইয়া দিলেন। সমস্ত দিনের পরিশ্রম ও কোলাহলের পর নিজের জন্য নির্দ্দিষ্ট কক্ষে আসিয়া বিজয়া যখন দুয়ার বন্ধ করিয়া দিল, তখন নির্জ্জন-সন্ধ্যা তাহার একক-শয্যাগৃহে ঘনীভূত হইয়া উঠিয়াছে। সন্ধ্যার হাওয়ায় বিছানার চাদরের ঝালর, মশারির প্রান্ত কাঁপিতেছে! ঘরের আলোটি জ্বালাইতেই এই সুসজ্জিত সুন্দর ঘরের একাকীত্ব পাষাণভারের মত তাহার মনে চাপিয়া ধরিল। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া সে পাশের ঘরে গেল, সেখানে তাহার বসিবার ঘর। সেখানে লিখিবার সর্ব্ববিধ উপকরণ সজ্জিত ছিল, একখানি চিঠি লিখিতে বসিল তাহার স্বামীকে। তাহাদের নূতন ঠিকানা জানাইয়া লিখিল :—

"প্রিয়তম,

প্রথমে মনে করিয়াছিলাম, তুমি যাহাকে সর্ব্বপ্রযত্নে দূরে

পাঠাইয়া দিলে, তাহাকে যখন ভুলিতেই চাহিয়াছ, তখন চিঠির ভিতর দিয়া আর মনে পড়াইয়া দিব কেন, কিন্তু দেখিলাম, তুমি ভুলিতে চাহিলেও আমি পারিনা।

মানুষের জীবনে প্রেম যখন প্রথম আসে, তখন সে তাহার কী সর্ব্বব্যাপ্ত অভিভূত মাদকতা! সমস্ত আকাশ ও পৃথিবী সে হরণ করিয়া নেয়। কিন্তু তাহার আয়ুষ্কাল কি এতই ক্ষণস্থায়ী? জানিনা সেসব দিন তোমার মনে পড়ে কিনা, যখন কেবল তোমার চুলের একটি বিশেষ গন্ধের স্মৃতি আমাকে এমন উতলা করিয়া তুলিত যে রাত্রিবেলায় কিছুতেই ঘুম আসিতনা। একটা মধুর আস্ত-স্মৃতিতে সমস্তরাত্রি কেমন করিয়া কাটিয়া যাইত টের পাইতামনা।

তুমি কি বলিতে চাও আমার মনের সেই আবেগ একেবারে নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে? আমি জানি, যায় নাই। কিন্তু তোমার দিক হইতে কোন আকর্ষণই নাই!

আমি আগাগোড়া সমস্ত ভাবিয়া দেখিতেছিলাম, তোমার সঙ্গে আমার আলাপ-হওয়ার প্রথম দিনটি হইতে। ভাবিয়া দেখিলাম, সত্যই তো, তুমি তো কখনই আমাকে তেমন প্রবল ভাবে চাও নাই! কিন্তু যদিবা না চাহিয়া থাক, আমার-চাওয়াকে আর আমি ফিরাইতে পারিনা, তাই এই নির্জ্জন-ঘরে বসিয়া তোমার কথাই মনে আসিতেছে। সেইজন্য, তুমি ভুলিতে চাহিয়াছিলে তবু আমি এই চিঠি লিখিলাম, ক্ষমা করিও।"

*

* *

উত্তর আসিল——

"বিজয়া, আমি স্পষ্ট যেন চোখের সুমুখে দেখিতে পাইতেছি, তুমি তোমার চির-অভ্যস্ত ষ্টাইলের মধ্যে ফিরিয়া গিয়াছ। তুমি সোফায় হেলান দিয়া বসিয়া আছ, আয়া তোমার পা মুছিয়া লইয়া সন্তর্পণে চটিজুতা পরাইয়া দিতেছে—হাতের কাছে ধূমোত্থিত চায়ের পেয়ালা আনিয়া ধরিল! তোমার নিরবচ্ছিন্ন অবকাশ। অলস সকালবেলায় গুন্‌গুন্ করিয়া গানের একটা লাইন গাহিতে বসিয়া হঠাৎ তোমার—আমার কথা মনে পড়িয়া গেল, প্রেমের স্মৃতি রোমন্থন করিতে বসিলে! কিন্তু আমি নিশ্চয় জানি বিজয়া, যে মুহূর্ত্তে তোমাকে এই ষ্টাইল হইতে বিযুক্ত করিব তখনই তোমার প্রেম, সৌরভ এবং স্মৃতি নিঃশেষে দূর দিগন্তে মিলাইয়া যাইবে।

তাই আমার সাধনা—যেমন করিয়া পারি তোমার উপযুক্ত ষ্টাইলে তোমাকে রাখিব। তুমি অভিমান করিয়া প্রশ্ন করিতে পার, সমস্ত ষ্টাইল হইতে দূরে সরাইয়া কেবলমাত্র বিজয়া বলিয়াই কি তোমার একটি বিশেষ মূল্য নাই?

আমিও এককালে তাই মনে করিতাম, কিন্তু দেখিলাম, সে মনে-করা ভুল। তুমি রাগ করিয়োনা বিজয়া, আমার নিজের

যখন প্রথম মোহ ভাঙ্গিল, তখন আমার ক্লেশ কি কম হইয়াছিল!

মনে আছে, বিয়ের আগে একদিন তুমি আমাকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছিলে। তোমাদের বিমুখ-পরিবার তখনও আমার প্রতি একান্ত বিমুখ ছিল। সেই বিমুখতার মাঝেও তুমি একান্তভাবে আমাকে কামনা করিয়াছিলে। তখন আমি মনে মনে কত কি ভাবিয়াছিলাম, রাত্রি জাগিয়া বারংবার রবীন্দ্রনাথের কবিতার বই খুলিয়া পড়িয়াছিলাম——

"আমরা দু'জনা স্বর্গ-খেলনা
গড়িবনা ধরণীতে,
মুগ্ধ ললিত অশ্রু-গলিত গীতে।
পঞ্চশরের বেদনা-মাধুরী দিয়ে
বাসর রাত্রি রচিবনা মোরা, প্রিয়ে;
ভাগ্যের পায়ে দুর্ব্বল প্রাণে
ভিক্ষা না যেন যাচি।
কিছু নাই ভয়, জানি নিশ্চয়
তুমি আছ, আমি আছি।"

কিন্তু ক্রমশঃ আবিষ্কার করিলাম, পুরুষের এই দুঃসাধ্য সাধনায় সঙ্গিনী হইবার মত মনের বল তোমাদের আধুনিক-মেয়েদের নাই। এ তোমার ব্যক্তিগত কোন অপূর্ণতা নয়। এ অনেকটা আধুনিক-যুগের অসম্পূর্ণতা।

কিন্তু থাক এ সকল বাজে কথা।

তুমি বেশ মনের আনন্দে, সর্ব্বাঙ্গীন কুশলে থাকিও। আমার খবর মাঝে মাঝে দিবার চেষ্টা করিব।”

চিঠি পড়িয়া বিজয়ার রাগ হইল। কিসের এত অসম্পূর্ণতা-অসম্পূর্ণতা বলিয়া চীৎকার! কেন, নিজের কি কোন অসম্পূর্ণতা নাই! মানুষটার বড় বেশি গর্ব্ব। চিঠি লিখিবার প্যাডটা টানিয়া সে অন্যমনস্ক-মনে আঁকিবুকি কাটিতেছিল, বাহিরে বেবীর উচ্চহাস্য এবং দ্রুতধাবনের শব্দ শোনা গেল। পরমুহূর্ত্তে সে ছুটিয়া আসিয়া বিজয়ার গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, “কে এসেচেন নীচের-তলায় বল দেখি? আজ তো পণ করে এসেচেন তোমার সঙ্গে আলাপ না করে উঠবেননা। এখন তোমার ধ্যান ছেড়ে চল দেখি।”

“কে এসেচেন, কুমারবাবু বুঝি? তাইনা-বলি মুখে এত হাসি কেন, আচ্ছা, চল উঠি।”

বিজয়া বসিবার ঘরে পা দিয়া দেখিল, পঁচিশ ছাব্বিশ বছরের একটি যুবক বসিয়া আছে। দেখিতে অতিশয় সুশ্রী।

উঠিয়া দাঁড়াইয়া নমস্কার করিয়া যুবক মৃদু হাসিয়া কহিল, “আপনার নাম বিজয়াদি? এঁর মুখে আপনার কথা এত শুনেচি যে……আমার কথাও নিশ্চয়……”

বিজয়া হাসিয়া কহিল, “ততোধিক শুনেচি। কাজেই পরিচয়ের আর বড় কিছু বাকী নেই।”

কুমারকান্তি ছেলেটি অত্যন্ত সপ্রতিভ—বলিল, "তাহলে একদিন কষ্ট করে আমাদের বাড়ী যেতে হয় বিজয়াদি, তা'নইলে পরিচয়টা পাকা হয়না।"

"যাব বইকি।"

কুমারকান্তি গোলাপের তোড়া হইতে বাছিয়া একটি ফুল খুলিয়া নিয়া বলিল, "আপনার সঙ্গে আমার আলাপ নেই বটে, কিন্তু আপনার স্বামীর সঙ্গে আমার প্রায় রোজই ইম্পীরিয়াল-লাইব্রেরীতে দেখা হয়।"

"আপনার পড়াশোনার ঝোঁকও আছে বুঝি?"

"একটু-আধটু।"

বিজয়া একটু আশ্চর্য্য হইল। যে-ছেলে রোজ শুধু পড়িবার জন্যই ইম্পীরিয়াল-লাইব্রেরীতে যায়, তাহার সঙ্গে বেবীর মত মেয়ের হৃদ্যতা, বন্ধুত্ব এবং অবশেষে সে বন্ধুত্ব ভালোবাসায় পরিণত হইল কেমন করিয়া!

কুমারকান্তি মৃদু মৃদু হাসিতে হাসিতে বিজয়ার দিকে চাহিয়াছিল, বলিল, "বলবো আপনি কি ভাবচেন? ভাবচেন এদের দু'জনের মিল হোল কেমন করে এবং সে মিল কোথায়? কেমন, নয়? কিন্তু আমি বলবো, আপনি একটু ভুল করচেন বিজয়াদি, স্ত্রীর কাছে বুদ্ধির দিক থেকে সহযোগিতা আমরা চাইনে, আমরা চাই পরিপূর্ণ আত্মনিবেদন। তাই পেলেই আমাদের সমস্ত সত্তা চরিতার্থ হয়ে যায়। কিন্তু মজা হয়েছে কি জানেন,

মডার্ণ-শিক্ষার ধারা এই জিনিষটাকেই বদলে দিচ্ছে। মেয়েরা বুদ্ধির দিক থেকে হয়তো পুরুষকে আগের চেয়ে আরও বুঝতে পাচ্ছে কিন্তু নিজেকে তারা সর্ব্বতোভাবে দিতে পাচ্চেনা। তাই তো এত……” বেবী বাধা দিয়া কলকণ্ঠে হাসিয়া উঠিয়া বলিল, “এইবার বুঝি বিদ্যাবাগীশ ম’শায়ের বক্তৃতা সুরু হ’লো? তা মিলেছে ভালো। বিজয়াদি নিজেও তোমার মত ভাবুক, ওর সঙ্গে যত খুসী কথা বলতে পার, মন দিয়ে শুনবে। কিন্তু আজকালকার মেয়েদের যতই দোষ দাও, তাদের নইলেও তো একদণ্ড চলেনা।”

কুমারকান্তি হাতজোড় করিয়া বলিল, “আ সর্ব্বনাশ! তুমি আবার কোথা থেকে? এই-না শুনলুম তোমার মা তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন, কখন আবার পিছন থেকে এসে দাঁড়িয়েছ! যা শুনেছ সে কেবল সাধারণ সমালোচনা। কিন্তু তোমাকে বাদ দিয়েই আমার সকল সমালোচনার ধারা বইচে, বলি সেকথা ভুলে যাওনি তো?”

বিজয়া হাস্যোজ্জ্বলমুখে বলিল, “ভুলে কেন যাবে, স্ত্রীজাতি-নির্ব্বিশেষে আপনি যতই আলোচনা করুন, বেবী মনে মনে ভালো করেই জানে আপনার মনের কথা, ‘এমনটি আর পড়িলনা চোখে, আমার যেমন আছে।”

বেবীর মুখে চোখে আনন্দের বন্যা, ঝর্ণার মত শরীর এবং

মনের ছন্দ সর্ব্বদাই প্রবাহমান। একমিনিট সে স্থির হইয়া দাঁড়াইতে পারেনা।

একটা রিভল্‌ভিং (ঘূর্ণিচেয়ার) চেয়ারে বসিয়া ঘুরপাক খাইতে খাইতে সে বলিল, "আর বিজয়াদি, তুমি নিজে বুঝি সে কথা লেশমাত্র কম জানো,·········হাঃ হাঃ, 'এমনটি আর পড়িলনা চোখে, আমার যেমন আছে·········'কি একটা কবিতায় রয়েচে না বিজয়াদি? হ্যাঁ, মনে পড়েচে, সেই যে রাত্রিতে তুমি রবিঠাকুরের পুরস্কার-কবিতাটা পড়ছিলে। কিন্তু তুমি নিজে? বুঝলে গো, একদিন বিজয়াদির বাড়ী বেড়াতে গিয়েছিলেম, বিজয়াদি উঠে রান্নাঘরে গেল চা করতে, অমনি সঙ্গে সঙ্গে দেখি জামাইবাবুও রান্নাঘরে ঢুকেচেন। হাঃ হাঃ, কী মজা বলো ত'?"

বিজয়ার মুখ গম্ভীর হইয়া উঠিল। এতক্ষণ লঘু হাস্য-পরিহাসের আনন্দে সে নিজের মনের কি একটা কথা যেন ভুলিয়াছিল, হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল।

কুমারকান্তি যাইবার আগে আর একবার সবিনয় নিবেদন জানাইয়া গেল, কাল দুপুরে সে গাড়ী পাঠাইবে, যেন বিজয়া দয়া করিয়া একবার যায়।

*

* *

একটা সোফার উপর কুমারকান্তি বসিয়াছিল, নীচে মোটর দাঁড়াইবার আওয়াজ পাওয়া গেল। বিজয়া আসিয়াছে, সঙ্গে করিয়া বেবীকেও আনিয়াছে। সে উঠিয়া অভ্যর্থনা করিয়া আনিল। এই ঘর! ঘরে ঘরে ক্রেজীর কাজ, মার্ব্বেলের কাজ। মেহগ্নির দরজা জানালা। সিঁড়িতে অত্যন্ত পুরু দামী-কার্পেট বিছানো। ঐশ্বর্য্যের এত সমাবেশ! বিজয়া অবাক হইয়া চাহিয়াছিল।

"চলুন, মায়ের কাছে। তিনি আপনাকে দেখলে খুব খুসী হবেন।" কুমারকান্তি তাহাদের সঙ্গে লইয়া মায়ের মহালের দিকে চলিল।

পাথরের মেঝেতে বসিয়া মা তখন চোখে চশমা দিয়া শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত পড়িতেছিলেন, বিজয়া আসিয়া প্রণাম করিল। তিনি স-প্রশংস দৃষ্টিতে এই ধীর স্থির অগ্নিশিখার মত সুন্দরী মেয়েটির দিকে চাহিলেন। পরিচয় হইল। বিজয়া তাঁর হাতের বইখানি নাড়াচাড়া করিতে করিতে বলিল, "এ বইখানি আমিও পড়েছি, ভারি সুন্দর বই।"

তাহার সঙ্গে যত কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল, যত পরিচয় হইল, ক্ষুব্ধ কুমারকান্তির মায়ের ততই মনে হইতে লাগিল, ‘আহা, এমনই একটি শান্ত, ধীর, নম্র মেয়ে যদি আমার বৌ হইত!’

তাই তিনি বেবীকে দেখাইয়া দেখাইয়া বিজয়াকে অত্যধিক সমাদর করিতে লাগিলেন এবং শুনাইয়া অনেকবার বলিলেন, “নিজের দিদি তোমার হ’ন? ওর কাছে চাল-চলন স্বভাবের মাধুর্য্য শিখো। আহা মা, আমি একদিন দেখেই বুঝতে পেরেচি, লক্ষ্মী মেয়ে।”

তাঁহার মহাল হইতে বিদায় লইয়া কুমারকান্তির বসিবার ঘরে সবাই আসিয়া ঢুকিল। এইখানে চা খাওয়াইবার আয়োজন হইয়াছিল।

বেবী তদারক করিতেছিল, ইতিমধ্যে সে বাগানে গেল মালীকে দিয়া ফুলের তোড়া তৈরী করাইতে। বিজয়া যতই আমোদ-প্রমোদে যোগ দিক, তাহার মনের অসম্ভব একটা শূন্যতা-বোধ ক্রমশঃ এত বাড়িয়া উঠিতেছিল যে সে নিজেই ভীত হইয়া উঠিতেছিল। সবারই আনন্দে কেন সে মন খুলিয়া যোগ দিতে পারেনা, কেনই বা তার মনের এই হাহাকার!

কুমারকান্তি সহসা বলিল, “ক্ষমা করবেন, যদি একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞেস করি?”

বিজয়া চমকিয়া উঠিল, “কি কথা!”

“দেখুন, আপনার কথা আমি ওর কাছে সব শুনেচি।

আপনার ভাগ্যকে আমার হিংসা হয়। বিশেষ করে সরজিৎ-বাবুর কী সৌভাগ্য!"

বিজয়া মৃদু হাসিয়া বলিল, "আপনার এমন প্রবল ঈর্ষার কারণ?"

"না, ঠাট্টা নয়। সত্যি আমার দিকে চেয়ে দেখুন, আমি যাকে ভালোবাসি তাকে কতটুকু দিতে পারি? না-করতে পারি তার জন্য কোন গভীর ত্যাগ, না-করতে পারি কোন একটা দুর্লভ প্রয়াস। আমাদের সমাজকে জানেন, যেখানে পাত্রের পক্ষে কিছু অর্থ আছে সেখানে পাত্রীর মাতার লোলুপ দৃষ্টি। আমার অদৃষ্টের দোষে কিছু অর্থ আছে, কিন্তু সে-অর্থ আমার নিজের সৃষ্ট নয়—দৈবক্রমে বড়লোকের ঘরে জন্মেছি বলেই। আর সরজিৎবাবুর সঙ্গে ইম্পীরিয়াল-লাইব্রেরীতে আমার বিশেষ-ভাবে আলাপ হয়েচে, তাঁর আশা আদর্শের কথা প্রায়ই আমার সঙ্গে আলোচনা করেন। তাঁর প্রতিভা আছে, কিন্তু আপনার জন্যে তিনি কত ভাবেন আর আপনাকে স্বাচ্ছন্দ্যে রাখবার জন্যে তিনি কি অমানুষিক পরিশ্রম করচেন........ "

বিজয়ার চক্ষু ছল্‌ছল্‌ করিতেছিল, অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া সে বলিল, "আপনি ছাই জানেন........."

বেবী একরাশ ফুল লইয়া আসিল।

বিজয়া নিজেকে সংবরণ করিয়া লইয়া বেবীর দিকে চাহিয়া

বলিল, "তুমি যতক্ষণ ছিলেনা, ততক্ষণ ইনি তোমার গুণগান করছিলেন।"

বেবী ফুলের তোড়া বিজয়ার হাতে দিয়া বলিল, "কি রকম গুণগান? ওঁকে আমার বড় বিশ্বাস নেই। উনি সব পারেন, মুখে আট্‌কায়না কিছু।"

*

* *

বাড়ী ফিরিবার পথে বিজয়ার মনে একটা অদম্য আকাঙ্খা হইতে লাগিল, একটিবার সে তাহার নিজের ক্ষুদ্র স্বামীগৃহে নামিয়া খবর লইয়া যায়, তিনি কেমন আছেন, কি করিতেছেন।

মোটরের ড্রাইভারকে গাড়ী ঘুরাইয়া সে সরজিতের ঠিকানায় যাইতে বলিল।

বাড়ীর দরজায় গাড়ী থামিল। নামিয়া দেখিল, বাড়ীর গেটে তালাবন্ধ, সকল ঘরের দরজা বন্ধ। বাহিরের দরজায় প্রকাণ্ড একটা তালা। স্বামী কোথাও গিয়াছেন নাকি, ঘর-দুয়ার বন্ধ করিয়া? কিন্তু খানিকক্ষণের জন্য কোথাও গেলে এমন করিয়া বাড়ী বন্ধ করিবার প্রয়োজন ঘটেনা। সে ফিরিয়া আবার গাড়ীতে চড়িতে যাইতেছে, এমন সময় তাহার প্রতিবেশিনী শৈলজা পাশের বাড়ীর জানালা খুলিয়া হস্তের ইঙ্গিতে তাহাকে

ডাকিল। সে বোধহয় খবর জানে এই আশায় বিজয়া আবার গাড়ী হইতে নামিয়া ড্রাইভারকে কিছুকাল অপেক্ষা করিতে বলিয়া ধীরে পাশের বাড়ীতে ঢুকিল।

শৈলজা হাসিয়া বলিল, "কর্ত্তার খবর নিতে এসেচিস, কেন তুই কি জানিস্‌নে তিনি কাল দুপুরের ট্রেণে দিল্লী গেছেন কি একটা সরকারী পরীক্ষা দিতে? বারে! তোকে জানিয়ে যাননি, এই কি সম্ভব হতে পারে!—

সেখানে মাস-ছয়েক দেরী হবে। আমাদের এঁকে ডেকে ঘরের চাবি-টাবি সব জিম্মা করে দিলেন, মাঝে মাঝে বাড়ীটার দিকে দৃষ্টি রাখতে বললেন।" বিজয়া গম্ভীর হইয়া অন্যদিকে চাহিয়াছিল, কোন কথা বলে নাই।

তাহার মনের মধ্যে অভিমান-সমুদ্র উথলাইয়া উঠিতেছিল। বিজয়াকে তিনি এত পর ভাবেন, পরের বাড়ীতে পরের হাতে চাবি দিয়া গেলেন, তাহারা জানিতে পারিল তিনি কি করিতে-ছেন, কোথায় যাইতেছেন আর সে কিছুই জানিলনা—পরস্যাপি পর সে!

শৈলজা বলিল, "কিছু একটা হয়েচে বিজয়া, আমি বিশ্বাস করতে পারচিনে তোর স্বামী কোথায় গেল তুই জানিসনে। কিন্তু তোকেও বাহাদুর-মেয়ে বলি বিজয়া, স্বামী যদি মাঝে মাঝে রাগ করেই-বা শক্ত কথা দু'টো বলে, অমনি মোটর হাঁকিয়ে বাপের বাড়ী চলে যেতে হবে!—

কি কষ্টই-না গেল সরজিতবাবুর। অন্যমনস্ক-প্রকৃতির আপনভোলা মানুষ, ওঁর কি আসে ভাই ঘর গেরস্থালী চালানো! ইক্‌মিক্‌-কুকারে করে রাঁধতে যান, তা কত সময় পড়ায় এত অন্যমনস্ক যে কিছুই মনে থাকেনা। কুকারের জল পুড়ে সমস্তটা অখাদ্য হয়ে ওঠে, আমাদের এঁর সঙ্গে খুব ভাব। হঠাৎ বেড়াতে যেয়ে এই সব কাণ্ড আবিষ্কার করে এসে ইনি আমাকে বলেন, আমি চাকরকে দিয়ে সমস্তরকম খাবার সাজিয়ে পাঠিয়ে দিই। এমনই করেই তো দিন কাটচে অর্দ্ধেকদিন দেখি, বই-বগলে করে কোথায় চলেছেন, জামায় একটা বোতাম নেই, কাপড়টা হয়তো ময়লা, জামাটা ফর্সা। তুই কি করেই-বা ভাই এমন মানুষকে ফেলে বাপের বাড়ী থাকতে পারিস!"

বিজয়া ক্ষীণহাস্যে কহিল, "আমার মায়ের খুব অসুখ, একা থাকেন, দেখা-শোনা করবার কেউ তেমন লোক নেই তাই আমাকে তাঁর কাছে কিছুদিনের জন্যে নিয়ে গেলেন। আচ্ছা আজ উঠি ভাই, আর একদিন এসে বরঞ্চ খানিকক্ষণ বসব।"

মুহূর্ত্তের মধ্যে শৈলজার সুর বদলাইয়া গেল, বলিল, "তাই বল, মায়ের এমন অসুখ হ'য়েচে, একলা। তুই না-যেয়ে থাকতে পারবি কেমন করে! লোকে ছেলে মেয়ে পেটে ধরে কেন, এই অসময়ের জন্যেই তো, কিন্তু পুরুষমানুষগুলো তা বোঝেনা। তারা আজ নিজের মান অভিমান নিয়েই আছে।

আমার ঠিক এমনই হয়েছিল। আর-বছরে আমার মায়ের মর-মর অসুখ, সেজদা এ'লো নিতে। উনি মুখে বললেন বটে, যাও, কিন্তু মনে মনে গজ্‌রাতে লাগলেন।... "

বিজয়া উঠিয়া পড়িয়া বলিল, "আজ উঠি ভাই। হ্যাঁ, পুরুষ-মানুষদের স্বার্থপরতা সম্বন্ধে তোমার সঙ্গে আমার মতদ্বৈধ নেই।"

গাড়ীতে উঠিয়া বাড়ী-পৌঁছানো অবধি সমস্ত সময়টা তাহার যে কেমন করিয়া কাটিল তাহার কিছুই মনে ছিলনা। অত্যন্ত একটা আঘাত পাইলে মানুষের মন যেমন অসাড় হইয়া যায়, তাহারও তেমনি সমস্তরকম হৃদয়ানুভূতি সম্বন্ধে একটা অসাড়তা ঘটিল। তাহার মনে পড়িয়া হাসি পাইতে লাগিল যে, কিছুদিন আগে সরজিতের সঙ্গে বিবাহ হইবার পূর্ব্বে, সরজিতের সম্বন্ধে তাহার এমন একটা আকুলতা উপস্থিত হইয়াছিল, তাহাকে একদিন না দেখিতে পাইলে মানসিক যন্ত্রণার সঙ্গে শারীরিক যন্ত্রণাও যেন হইত। আশ্চর্য্য! একজন মানুষের প্রতি আর একজনের এমন তীব্র আকর্ষণও হয়। কিন্তু তাহার দাম কি? সংসারের স্রোতে আকুলতার স্থান নাই, যদিবা আছে সে বড় ক্ষণস্থায়ী।

মনের এমনই একটা তীব্র বৈরাগ্যের মধ্যে সে যখন বাড়ী আসিয়া পৌঁছিল, দেখিল, খদ্দরের শাড়ি-পরিহিত তিন চারজন মেয়ে বসিবার ঘরে তার মায়ের সঙ্গে কি কথাবার্ত্তা বলিতেছে।

সরোজিনী দেবী মেয়েকে দেখিয়াই বলিয়া উঠিলেন, "এইযে বিজয়া, এঁরা অনেকক্ষণ থেকে তোমার জন্য অপেক্ষা করচেন। তুমি এ'লে, এইবার কথাবার্ত্তা হতে পারবে।"

একটি মেয়ে বলিতে লাগিল, "কাগজে পড়েচেন, বাঁকুড়া-জেলার দারুণ বন্যার কথা! জানেন তো উপরি-উপরি দু'বছর ধান হয়নি, ওদিকে অত্যন্ত দুর্ভিক্ষ অন্নকষ্ট চলছিল। তার উপর এই বন্যা·········। আমরা নারী-কল্যাণ-সেবাশ্রমের তরফ থেকে এ-কাজে কিছু সাহায্যের ভার নিয়েচি।······"

বিজয়া নিমেষের মধ্যে উৎসাহে উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিয়া বলিল, "নিশ্চয় নেবেন। দেশের সকল রকম কাজেই মেয়েদের করবার অনেক কিছু রয়েচে। কিন্তু কি জানেন, এভাবে বাড়ী বয়ে-বয়ে যেচে চাঁদা সেধে বেড়ালে বড় কিছু পাবেননা। তার চেয়ে কোন চ্যারিটি-পার্‌ফর্ম্মেন্স-গোছের কিছু করুন, লোকে খুসী হয়ে টাকা দেবে।"

একটি মেয়ে উৎসাহিত হইয়া বলিল, "আপনি যা বলচেন একথা অবলাদিকে আমি আগেই বলেছিলেম। কিন্তু অনেক কিছু জোগাড় করতে হবে। একটা জায়গা চাই যেখানে মেয়েদের নিয়ে রিহার্সে´ল দেবার বন্দোবস্ত করতে হবে।"

বিজয়া বলিল, "আমাদের এতবড় বাড়ীতে অনেক ঘর খালি পড়ে থাকে। নীচেরতলার ঘর হ'লে অনায়াসে আপনারা মেয়েদের জোগাড় করে রিহার্সে´ল দিতে পারেন। আমি যতদূর

সম্ভব আপনাদের হেল্প্ করব। আমার একটি মাস্তুত বোন রয়েচে, কাছেই থাকে, বেথুন-কলেজিয়েট স্কুলে পড়ে। বেবী এসব বিষয়ে একটা জীনিয়াস (প্রতিভা) বল্লেই হয়। আমি তাকে বোলব, সে খুব আনন্দের সঙ্গে এতে যোগ দেবে।"

নারী-কল্যাণ-আশ্রমের সেবিকার দল আশাতীত সাহায্য পাইয়া উৎসাহের সহিত কাজে লাগিলেন। বেবীর বাড়ীর ঠিকানা লইয়া তাঁহারা সেদিনকার মত বিজয়ার নিকট বিদায় লইয়া উঠিলেন।

দেখিতে দেখিতে বিজয়া এইসব কাজে এত মাতিয়া গেল যে তাহার নাওয়া-খাওয়ার সময় রহিলনা। কোন একটা ক্লেশ ভুলিবার জন্য লোকে মাদকদ্রব্য ব্যবহার করে। সে নিজের মনের একটা প্রবল অভিমান ভুলিবার জন্য দিবারাত্রি এইসব কাজে ব্যাপৃত রহিল।

*

*   *

স্বদেশী-প্রদর্শনীতে নিজের হাতের উলের বোনা কিছু মাফ্‌লার সোয়েটার মোজা ইত্যাদি বিক্রয় করিতে দিয়া বন্যা-রিলিফ্-কমিটির জন্য অর্থ সংগ্রহ করিবে এই উদ্দেশ্যে আজকাল কতকগুলি

কানপুরের পশম এবং কাঁটা লইয়া বিজয়া সর্ব্বদাই শেলাইয়ে ব্যস্ত।

বেবী এসব ভালোবাসেনা। তাহার প্রকৃতিতে একজায়গায় চুপ করিয়া বসিয়া থাকা লেখেনা। সে আসিয়া সোরগোল করিয়া বিজয়ার হাতের কাঁটা কাড়িয়া লইয়া উল ছড়াইয়া দিয়া বলে, "বাবাঃ, বিজয়াদিকে আজকাল সেলাইয়ের ভূতে পেয়েচে! কোথাও বেড়াতে যাবেনা, কারও সঙ্গে গল্প করবেনা, রাতদিন কতকগুলো বিশ্রী উল নিয়ে বসে আছে।"

বিজয়া হাসিয়া তাহার হাত হইতে পুনরায় সেলাইয়ের কাঁটা কাড়িয়া লইয়া বিচ্ছিন্ন-সূত্র যোজনা করিয়া বলে, "দাঁড়া, সংসারে এসে গরীব দুঃখীর কথা ভাববিনে, কেবল নিজে আমোদ করবি! তা কি করতে হয়......"

"যাও যাও, তোমার ধর্ম্মের বক্তৃতা শুনতে আসিনি। এসেছিলেম তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করতে।"

"কি কথা?"

"আজ দেবদাস হচ্চে চিত্রায়, উনি সীট বুক্ করে রেখে এসেচেন, তিনজনের মত। তোমাকে যেতেই হবে।"

দিন-পনের হইল কুমারকান্তির সঙ্গে বেবীর শুভবিবাহ নিষ্পন্ন হইয়া গেছে। বিজয়া স্মিতমুখে তাহারই ইঙ্গিত করিয়া বলিল, "কুমারবাবু কবে থেকে 'উনি' হয়েচেন শুনি?......কিন্তু তোরা যা। আমি সিনেমা দেখতে ভালোবাসিনে।"

সঙ্গে সঙ্গে কুমারকান্তি ঘরে ঢুকিয়া বলিল, "আপনাকে ভালোবাসতেই হবে!"

"আ .সর্ব্বনাশ! বেবীর সামনে অমন কথা! আর কখনো বলবেননা, বলবেননা!" বেবী আরক্ত হইয়া উঠিল

কুমারকান্তি টেবিলে সশব্দে একটা চড় মারিয়া বলিল, "বাজে কথা রেখে দিন। কেন আপনি যাবেননা শুনি? কেবলই বুড়োর মত এ-ভালোবাসিনে সে-ভালোবাসিনে। জগৎ সংসারে কি ভালোবাসেন শুনি; কেবল বিশ্রী কতকগুলো উল নিয়ে রাতদিন ঘাড়গুঁজে সেলাই করতে?"

বেবী মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিল, "জামাইবাবু অনেকদূরে বিদেশে রয়েচেন, তাই বিজয়াদির মনে স্ফূর্ত্তি নেই, কিছুই আর ভালো লাগেনা।"

"কিন্তু ভালো লাগতেই হবে। যাঁর জন্যে তাঁর কিছুই ভালো লাগেনা, এ তাঁরই আদেশ। একেবারে খোদ কর্ত্তার। এই নিন্, পড়ুন তাঁর চিঠি।"

পকেট হইতে একখানি চিঠি বাহির করিয়া কুমারকান্তি টেবিলের উপর রাখিল। বিজয়া অন্তরের একটা অদম্য-স্পৃহা রোধ করিয়া বলিল, "বারে, পরের চিঠি আমি পড়ব কেন?"

"আমাকে লেখা হ'লেও এ চিঠি আপনার কথাতেই ভরা। অতএব এ আপনার পড়াই উচিত। আচ্ছা, আমিই পড়চি।"

কুমারকান্তি পড়িতে লাগিল,

দিল্লী
৫ই ডিসেম্বর

"প্রীতিভাজনেষু,

তোমার আন্তরিক শুভকামনাপূর্ণ চিঠিখানি পেয়ে বিশেষ সুখী হয়েচি। তোমাদের শুভবিবাহে যোগ দিতে পারলেমনা বলে খুব দুঃখিত। তুমি আমার বন্ধু ছিলে, এখন স্নেহাস্পদ আত্মীয়ে পরিণত হলে। বিজয়া তোমাদের প্রতিবেশী জেনে অনেক পরিমাণে নিশ্চিন্ত বোধ করেচি। তার প্রকৃতিতে অনেক খামখেয়ালিতা আছে, কাজেই তোমার চিঠিতে যখন পড়লেম, সে আজকাল বাহিরে যাওয়া একদম ছেড়ে দিয়েচে, নিজের শরীরের প্রতিও উদাসীন, তখন বিশেষ বিস্মিত হইনি। কিন্তু তার জন্যে আমার মনে মনে ভারি একটি উদ্বেগ রয়েচে। তুমি তাকে অনুরোধ কো'র, যাতে সে শরীরের যত্ন নেয় ও বেশ প্রফুল্লচিত্তে থাকে। আমাদের পরীক্ষা হয়ে গেছে, এই অবসরে আমি আগ্রা, মথুরা, বৃন্দাবন, এলাহাবাদ এই কয়েকটা জায়গা বেড়িয়ে এসেচি। শুনচি আর এক-সপ্তাহের মধ্যেই পরীক্ষার ফল বা'র হবে, ফলটা দেখে তারপর ফিরে যাব। বিজয়াকে আমি আর আলাদা করে চিঠি দিলেমনা। তার সম্বন্ধে আমার একটি কর্ত্তব্য রয়েচে, সেইজন্যে আমার চেষ্টার ও সাধনার ত্রুটি নেই। যতদিন তা' না সফল করতে পারি

ততদিন তাকে চিঠি দেবনা স্থির করেচি। বেবী ও তুমি আমার সাদর সম্ভাষণ এবং ভালবাসা নিয়ো।”

চিঠি পড়া হইয়া গেলে কুমারকান্তি কিছুকাল চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, “আপনার সম্বন্ধে তাঁর কি কর্ত্তব্য আমি বুঝে উঠ্‌তে পারিনে। তিনি যখন আই-সি-এস পরীক্ষা দেবার জন্যে তৈরী হচ্ছিলেন, তখনই এ-নিয়ে তাঁর সঙ্গে আমার কথা হোত। আমি বলতেম, আপনার স্ত্রীর প্রতি আপনার চরম কর্ত্তব্য এ-নয় যে আপনাকে আই-সি-এস হতেই হবে। তিনি একটু হেসে বলতেন, আপনাদের সমাজে যখন বিয়ে করেচি, তখন আমার চরম কর্ত্তব্যের নিশানা এ ছাড়া আর কিছু হতেই পারেনা। আপনাদের মধ্যে একটা কিছু নিশ্চয় হয়েছিল। আমার মনে হয়, তিনিও আপনাকে বুঝতে পারেননি, আর ক্ষমা করবেন আমাকে একথা বলার জন্যে যে, আপনিও তাঁকে বুঝতে পারেননি।”

বিজয়া হঠাৎ উঠিয়া পড়িয়া বলিল, “বসুন আপনি, আমি আপনাদের চা দিতে বলে আসি।” পাশের দরজা দিয়া সে দ্রুতপদে চলিয়া গেল। নিজের ঘরে আসিয়া নিজেকে সংবরণ করিয়া লইতে তাহার কিছুক্ষণ কাটিয়া গেল। অন্যের কাছে চিঠি লিখিয়া সে বিজয়ার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে কতই-না উদ্বেগ প্রকাশ করিয়াছে, কত উপদেশ দিয়াছে, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত বিজয়াকে একছত্র চিঠি লিখিয়া জানায় নাই। কিসের জন্য তাহার এমন

ব্যবহার ! সে কি এমন কথা অহর্নিশি সরজিতকে বলিয়াছিল যে, অনেক টাকা না হইলে সে মরিয়া যাইবে !

কিয়ৎকাল পরে আবার যখন বসিবার ঘরে ফিরিয়া আসিল, দেখিল, বেয়ারা আসিয়া চা দিয়া গিয়াছে—কুমারকান্তি, বেবী চা খাইতেছে। তাহাকে দেখিয়া বেবী বলিল, "কি বিজয়াদি, যাবে তো? জামাইবাবুর যখন হুকুম তখন এইবারে একটু-আধটু না বা'র হলে চলবেনা, বুঝেচ? তৈরী হয়ে থাক, ছ'টা বাজতে আর বড় দেরী নেই।"

*

* *

প্রেক্ষাগৃহ অন্ধকার, নীরব। শিল্পীর অপরূপ হৃদয়দ্রবকারী রচনায় দর্শকের চোখে জল আসে। বিজয়া অভিভূত মুগ্ধ হইয়া 'দেবদাস' দেখিতেছিল।

প্রেমের আকুলতা, অভিমান, তীব্রতা এতই অসংশয়িতরূপে ছবির পর্দ্দায় ধরা দিয়াছে যে, তাহার সমস্ত চিত্ত বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিতেছিল। নিজের জীবনের কথা শতবার শতভাবে মনে পড়িয়া যাইতেছিল।

যেখানে আছে, বাহিরে শানাই বাজিতেছে—সেই করুণ মধুর শানাইয়ের শব্দ, বিবাহের মঙ্গলাচরণকে মনে পড়াইয়া দেয়।

শানাইয়ের শব্দ···পার্ব্বতীর বিবাহ···কত স্মৃতিই-না মনে পড়াইয়া দেয়! ·· দেবদাস তাড়াতাড়ি উঠিয়া জানালা বন্ধ করিয়া দিয়া আসিল। বিজয়া আত্মবিস্মৃত হইয়া দেখিতেছিল। তাহার মনে পড়িয়া যাইতেছিল, সরজিৎ চাঁপাফুল ভালোবাসে তাই তার বসিবার ঘরে বাগান হইতে চাঁপাফুল আনিয়া বিজয়া রোজই সাজাইয়া রাখিত। সেই গন্ধ, কত স্মৃতি কত কথার সহিত জড়িত মিশ্রিত হইয়া গিয়াছিল। এমনই এক-একটা গন্ধ বা শব্দের ইঙ্গিতে কত কথাই-না কেমন করিয়া মনে পড়াইয়া দেয়!

চিত্রাভিনয় শেষ হইয়া গেল। ভারাক্রান্ত-মনে সকলের সহিত সে'ও উঠিয়া দাঁড়াইল। গাড়ীতে একটা কথাও সে বলিতে পারিলনা। কুমারকান্তি একবার প্রশ্ন করিল, "কেমন লাগলো বলুন দেখি? অনর্থক জিদ ধরেছিলেন যাবনা বলে। না গেলে কি এমন চমৎকার জিনিষটি দেখতে পেতেন?"

বিজয়া কোন উত্তর দিলনা।

কুমারকান্তি বুঝিতে পারিল, তাহার মনের ভাব গভীর কোন লোকে আছে—সকল প্রশ্নোত্তরের বাহিরে।

সেদিন রাত্রিতে বিজয়ার ভালো ঘুম হইলনা। কেবলই ঘুম ভাঙ্গিয়া যায় আর কোন একটা গভীর মধুর অভিমানে তাহার সমস্ত মন ভরিয়া ওঠে। সকালবেলায় একটু বেলা করিয়া ঘুম ভাঙ্গিল। প্রাতরাশ সারিয়া বসিবার ঘরে আসিতে-না-আসিতে

খবর আসিল, নারী-কল্যাণ-সমিতির সেক্রেটারী দেখা করিতে আসিয়াছেন।

বিজয়াকে দেখিয়া নমস্কার করিয়া অবলা দেবী বলিলেন, "দেখুন, এই স্বদেশীমেলা উপলক্ষ্যে একটা ওরিজিন্যাল (মৌলিক) আইডিয়া আমার মাথায় এসেচে। ছোট ছোট মেয়েদের একটা স্বদেশী গান শিখিয়ে যদি চরকা নিয়ে আমাদের ষ্টলে বসিয়ে দেওয়া যায়...... আপনার এ সম্বন্ধে মতামত কি বলুন। আপনার সত্যিকার মত নইলে তো আমরা কোন কাজে নামতে পারিনে।"

তাহাকে বিদায় দিতে দিতে বন্যা-রিলিফ-কমিটির কর্ত্তা আসিয়া হিসাব-নিকাশ পেশ করিলেন, আপনার কথামত আজ ভবানীপুরের ও-দিকটা সেরে আসা গেল। তারপরে, আপনার ঐ উলের কাজগুলো কতদূর হ'লো? আমাদের স্কুলের মেয়েদের দিয়েও কিছু কিছু সূঁচের কাজ আর কাটা-কাপড়ের কাজ করিয়েচি, মেলাতে বেশ বিক্রী হবে বলে।......"

বিজয়ার অত্যন্ত বিরক্তি ধরিতেছিল, কেন সে এইসব কাজের মধ্যে নিজেকে এমন করিয়া নিমজ্জিত করিয়া ফেলিতে গেল! কোন কাজেই আর তার উৎসাহ বোধ হইতেছিলনা। একটা বিপুল শ্রান্তির ভারে মন আচ্ছন্ন হইয়া আছে। একটু পরে বারোটার ডাকে একটা চিঠি আসিল, সরজিতের চিঠি, লিখিয়াছে :—

"বিজয়া,

এইমাত্র খবর পেলেম, আই-সি-এস্ কম্‌পীটিশনে আমি ফার্ষ্ট হয়েচি, দু'একদিনের মধ্যেই গেজেটে বার হবে। দু'বছরের জন্যে চললেম বিলেত। নিয়ম-কানুন তো জানো? দু'বছর ট্রেনিং-পীরিয়ড্। খরচ সমস্তই ওদের। তারপরে ফিরে এসে পাকা কাজে বাহাল হবো। যে-মন নিয়ে যাচ্ছি, সেই মন নিয়ে ফিরতে পারবো কিনা জানিনে। কিন্তু তোমার বাপের বাড়ীর ষ্টাইল আর আমাকে দিয়ে কখনো ক্ষুণ্ণ হবেনা। আমার বাড়ীতে তোমার আর কষ্ট হবেনা, তুমি সমান ষ্টাইলে থাকতে পারবে। আমার শরীর তত ভালো নেই, একটু অতিরিক্ত পরিশ্রম করতে হয়েচে, এবারে কিছু বিশ্রাম নিয়ে সেটা পুষিয়ে নেব। যতদিন-না পরীক্ষার ফল বেরিয়েছিল মনটা খুবই উদ্বিগ্ন হ'য়েছিল। আশা করি ভালো আছ।"

বিজয়ার মা ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন, "কার চিঠিরে? পিয়ন প্রথমে আমার হাতে দিয়েছিল, মনে হ'লো জামাইয়ের চিঠি……"

বিজয়া আঙুল দিয়া টেবিলের উপর পরিত্যক্ত চিঠিখানার দিকে নির্দ্দেশ করিয়া বলিল, "ঐ তো, পড়ে দেখ না। কিয়ৎকাল ইতস্তত করিয়া অবশেষে সরোজিনী দেবী চিঠিখানা তুলিয়া লইলেন, একটুখানি পড়িয়া হর্ষে উচ্ছ্বসিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "সরজিৎ আই-সি-এস হয়েচে! আমি বরাবর জানি ও-ছেলে কিছু একটা করবেই। কিছু আগে থেকে বলেনি তো কখনো,

ভারি চাপা ছেলে। এত খুসী হয়েচি বিজয়া, যে কি বলবো। ওর ঠিকানাটা কি বল দেখি? আজই একটা চিঠি ওকে লিখতে হবে।"

*

* *

জাহাজের কোল্ডরুমে একসঙ্গে মাছ, মাংস, ফল, বীফ্ গাদাগাদি ঠাশাঠাশি করিয়া রাখা। ষ্টুয়ার্টের সঙ্গে একদিন সরজিৎ সেই দৃশ্য দেখিয়া আসিয়াছে, তারপর হইতেই তাহার গা ঘিন্‌ঘিন্ করিতেছে।

এইমাত্র ডিনারের ঘণ্টা পড়িল। নিজের কেবিনে আয়নার সামনে দাঁড়াইয়া নিখুঁতভাবে 'টাই' পরিবার চেষ্টা করিতে করিতে সে তিক্তচিত্তে ভাবিতেছিল, এখনি যাইয়া সেই সব অপ্রীতিকর স্বাদ এবং গন্ধের মাংস খাইতে হইবে। একমুহূর্ত্তের জন্য তাহার চোখের সুমুখে একটা দৃশ্য ভাসিয়া উঠিল;—কলিকাতার শ্যামবাজার-অঞ্চলে সেই ছোট্ট একতলা-বাড়ীর রান্নাঘরে বিজয়ার কাপড়ের অঞ্চলপ্রান্ত কোমরে জড়াইয়া অনভ্যস্ত-হাতে রান্না করিবার ছবি........ সে-ছবি কোনদিন মুছিবেনা তাহার মন হইতে। ডিনারের দ্বিতীয় ঘণ্টা পড়িল, আর দেরী করিবার অবসর নাই।"

'টাই' বাঁধাটা মনোমত হইল কিনা, একবার শেষবারের মত আয়নায় দেখিয়া লইয়া সে বাহির হইয়া পড়িল।

সাগরের জলে তখন চাঁদের প্রতিবিম্ব পড়িয়াছে, আকাশের তারাগুলি অনিমেষ নয়নে কাহার স্থির মর্ম্মভেদী দৃষ্টির মত চাহিয়া আছে।

দীর্ঘ পরিশ্রমের পর সরজিতের দেহে মনে একটা শিথিল ক্লান্তি। ইচ্ছা করেনা 'টাই' বাঁধিতে, ইচ্ছা করেনা নিখুঁতভাবে পোষাক পরিতে, নিখুঁত-কায়দায় সিগারেট্ টানিতে টানিতে সভ্য-সমাজের সভ্য-কায়দায় গল্প করিতে।

একটু অন্ধকার, একটু তারার আলো, কাহার অল্পদিনের মধুর স্মৃতি নিভৃতে বসিয়া ধ্যান করিতে ইচ্ছা করে, কিন্তু উপায় নাই! বিজয়াকে যাহা বলিয়া আসিয়াছিল তাহা সফল হইয়াছে। বিজয়া আই-সি-এস-এর পত্নী হইয়া দু'দিন বাদে বাড়ীতে ডিনার-পার্টি দিবে, শপিং করিতে বাহির হইবে, যথোচিত ষ্টাইলে, অভ্যস্ত আরামে থাকিবে। কিন্তু প্রেয়সী-নারীর যে বিরল মাধুর্য্যটুকু তাহার অনটনের সংসারে দু'দিনের জন্য প্রকাশিত হইয়া তাহার ধ্যানের ধন হইয়া দাঁড়াইয়াছে, সেটুকু কি আর খুঁজিলেও মিলিবে!

* * *

বিজয়া নিজের ঘরে বসিয়া অনাথ-সদনের সেক্রেটারীকে একখানা চিঠি লিখিতেছিল।

"সবিনয় নিবেদন,

আপনাদের যে কার্য্যবিবরণী আমাকে পাঠিয়ে দিয়েচেন, আমি তা' পড়ে মুগ্ধ ও বিস্মিত হয়েচি। প্রায় লোকচক্ষুর অন্তরালে সামান্য লোকবল এবং ধনবল নিয়ে আপনারা এইযে একটা সুন্দর সৎকাজের অনুষ্ঠান করেচেন, এর উপকারিতা সম্বন্ধে আমার সংশয়মাত্র নেই। আমি যথাসাধ্য এতে সাহায্য করতে প্রস্তুত আছি······"

বিজয়ার মা ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন, "কি হচ্চে বিজয়া? তোদের চরকা-স্কুলের অনাথবাবু সকাল থেকে নীচের ঘরে ধন্না দিয়ে বসে আছে·········কি ছেলেমানুষী নিয়ে মেতে আছিস? দু'দিন বাদে একটা সেরা-অফিসারের স্ত্রী হবি, এখনও কি তোর এই সব হুজুগে লেগে-থাকা চলে! সরজিৎ আমার ভালো-ছেলে, শেষে কি তার নাম হাসাবি নাকি? এই আজও মিসেস্ নর্টন আমাকে বলছিলেন—আমি বলি-কি মাসে টাকা-চল্লিশেক দিয়ে তাঁকে রাখি। আই-এ পর্য্যন্ত পড়েচিস, বই-টই তো দেখি কতই পড়িস। কিন্তু আই-সি-এস-মহলে দু'দিন বাদে মিশতে হবে, তাদের রীতি নীতি কায়দা এসবও শিখতে হবে বইকি, নইলে সোসাইটিতে তোকে ভারি অপ্রস্তুতে পড়তে হবে যে! মিসেস্ নর্টনের কাছে ইংরিজী উচ্চারণ, পিয়ানো, সেলাই এ-সবই শিখতে পারবি। সমস্তরকম ষ্টাইলের সমাজেই তখন মিশতে পারবি অনায়াসে, কোন কষ্ট হবেনা।"

আবার সেই ষ্টাইলের কথা ঘুরিয়া-ফিরিয়া আসে। বিজয়া মুদিত চক্ষুতে ভাবিতে লাগিল, ষ্টাইল জিনিষটার এমনই কি আকর্ষণী শক্তি যে······কিন্তু ভাবিবার বড় সময় ছিলনা। একেই তো চরকা-স্কুলের প্রেসিডেণ্ট অনাথবাবু সকাল হইতে অপেক্ষা করিয়া বসিয়া আছেন তার উপর সিঁড়িতে কুমারকান্তির গলার আওয়াজ পাওয়া যাইতেছে। একটুপরেই কুমারকান্তি ঘরে ঢুকিল, একটা চেয়ার টানিয়া বসিয়া বলিল, "নীচে কে একটি ভদ্রলোক বসেছিলেন, চরকা-স্কুলের ম্যানেজার না প্রেসিডেণ্ট না সেক্রেটারী কি বললেন। আমি তাঁকে বিদায় দিয়ে এসেচি, আপনাকে না-জিজ্ঞেস করেই। বললেম, বিজয়াদির আজ একটু কাজ আছে, ও-বেলা কিম্বা অন্তসময় আসবেন। আচ্ছা, ব্যাপার কি বলুন দেখি, কি নিয়ে দিন কাটাচ্চেন ?"

"কেন, দেশের কাজ কি আপনাদের মতে ছেলে-খেলার জিনিষ হ'লো ? কত বড় বড় লোক এইজন্মে সর্ব্বত্যাগ করেচেন।"

"আপনি যদি তা করতেন আমার বলবার কিছু থাকতনা। কিন্তু আপনি তো তা করচেননা। আপনি যা করচেন এ হচ্চে কেবল সময় কাটানো। সময় আপনার ভার হয়ে দাঁড়িয়েচে, তাই কোনরকমে কোন একটা কাজ উপলক্ষ্য করে সেটাকে বয়ে যেতে দিচ্ছেন।"

কুমারের তীক্ষ্ণদৃষ্টির সামনে বিজয়া মুখ নামাইল।

একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া কুমারকান্তি পুনরায় বলিয়া যাইতে লাগিল, "কিন্তু সময় আপনার কেনই-বা ভার হয়ে দাঁড়ালো, সেই কথাটাই মাঝে মাঝে আমি অবাক হয়ে ভাবি বিজয়াদি। কি এমন ঘটেচে যাতে আপনার মনের শূন্যতা-বোধ অপরিসীম হয়ে দাঁড়িয়েচে! আপনি মনে কিছু করচেননা তো বিজয়াদি? আপনাকে আমি যথার্থ ই দিদির মত ভালোবেসেচি, শ্রদ্ধা করেচি সেইজন্যেই আপনার মনের কোন ক্লেশ আমার মনে ভারি লাগে।

সরজিৎবাবুর সঙ্গে আমার খুব আলাপ হয়েছিল, আমাদের আলাপের সে-অংশটা আপনার অগোচর। তিনি তাঁর কথা কিছু কিছু আমাকে বলেছিলেন, তাঁর মনে দারিদ্র্যের একটি সুতীক্ষ্ণ আত্মসচেতনতা ছিল, আপনাদের ঘা আরম্ভ হ'লো সেইখান থেকে। তারপরে ঘাত-প্রতিঘাতের পালা একবার সুরু হলে সহজে আর থামতে চায়না, আপনাদেরও চাইলোনা। কিন্তু এবারে তো সেসব সমস্যার সমাধান হয়েচে ভাই! বাস্তবিক আমি ভারি খুসী হয়েচি। উনি আই-সি-এস পরীক্ষার্থীদের মধ্যে ফার্স্ট হয়েচেন, খবর পেয়েচেন নিশ্চয়। এবারে তিনি যথোপযুক্ত ধনী হলেন, আপনাকে যথোপযুক্ত স্বাচ্ছন্দ্যে এবং ষ্টাইলে····· "

আবার সেই ষ্টাইলের কথা। বিজয়ার মুখ লাল হইয়া উঠিল। সে তাড়াতাড়ি বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল, "আচ্ছা কুমার-বাবু, আমরা শিক্ষা, সভ্যতা, সংস্কৃতি যত কিছুর-ই বড়াই করি

আমাদের মনটা এখনও আদিম অবস্থায় রয়েচে। ধনীসম্প্রদায়ের এই আমারই মত মেয়েদের কথা মনে করে দেখুন, আমরা মুখে আদর্শবাদের যতই জয়গান গাই, কাজে কিন্তু কিছুতেই নিজেদের ষ্টাইলটি ছেড়ে থাকতে পারিনে। বিকেলে মোটরে একটু খোলা-হাওয়ায় না বেড়িয়ে এ'লে মাথা ধরে—আঃ সর্ব্বনাশ! তখন মোটরে বেড়ানো মুলতুবী রেখে বদ্ধঘরে রান্না করতে ব'সব! তারপরেও আর জীবনের বাকী রইল কি! প্রেম, মনের মিল, ওসব যে আকাশের ইন্দ্রধনুর মত মিলিয়ে যাবে, যদি যার সঙ্গে মনের মিল হয়েচে, বিয়ের পরে তার বাড়ীতে যেয়ে বিকেলে না বেড়াতে পেলেম, সিনেমা না যেতে পেলেম:.... "

কুমার বলিল, "আপনিও কি সেই দলের ?"

"অবিকল।"

"আমি তা বিশ্বাস করিনে।"

কুমার কিছুকাল চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "আচ্ছা, থাক ওসব নিরর্থক আলোচনা। আজকে যাবেন? য়ুনিভার্সিটি-ইনষ্টিট্যুটের হ'লে ভালো বক্তৃতা আছে। যিনি দেবেন তাঁর নাম সবাই জানে, আপনিও জানেন।"

বিজয়া হাসিয়া বলিল, "আপনি প্রায়ই আমাকে টানাটানি করে বাড়ী থেকে বা'র করেন দেখচি। কেন, এ বিষয়েও আপনার বন্ধুর কোন আদেশ রয়েচে নাকি ?"

"কার, সরজিৎবাবুর? কেন, তাঁর আদেশ কি, সে তো আমার চেয়ে আপনারই ভালো করে জানবার কথা, তা নয়। আমি আপনাকে—নিজেকে-নিজে চিনিয়ে দিতে চাই। নিজেকে আপনি চিনতে পারেননি। দেখুন, অনেকের সংস্পর্শে না এলে নিজেকে চেনা যায়না। সেইটেই আমি আপনাকে বুঝিয়ে দিতে চাই। আপনি তৈরী হয়ে থাকবেন, চারটের সময় আমি আর বেবী আসব।"

*

* *

সমস্ত সভায় তিলধারণের জায়গা নাই। বিজয়ারা আসিয়া যখন পৌছিল তখন সমস্ত কোলাহল থামিয়া গেছে, নিস্তব্ধ সভাতলে যিনি বলিবেন তিনিই কেবল ধীরপদে বক্তৃতামঞ্চে উঠিতেছেন। বিষয় ছিল, পরাধীন জাতির ভাগ্য। বলিবার ভঙ্গীর মধ্যে কোন রোমাঞ্চতা, কোন লোমহর্ষণ ভঙ্গী নাই। ধীর শান্ত দৃঢ়স্বরে যিনি বলিতেছেন, সমস্ত কথাই যেন তাঁর জীবনের সত্যকার অভিজ্ঞতা এবং অনুভব হইতে উৎসারিত হইয়া উঠিতেছে।

তিনি বলিতেছিলেন, কেমন করিয়া পরাধীন জাতির অশেষ-

বিধ দুর্গতির সহিত তাহার মনের সমস্ত জ্যোতি নিভিয়া আসে। কোথায় বিশ্বপ্রসারিত উদার-পৃথিবীর স্বপ্ন সে দেখিতে পাইবে, যাহাকে বাল্যকাল হইতে পঁচিশ ছাব্বিশ বছর পর্য্যন্ত একটা বিদেশী ভাষার ভিতর দিয়া য়ুনিভার্সিটির উদ্দেশ্যহীন, প্রাণহীন ব্যর্থ শিক্ষার কসরৎ আয়ত্ত করিতেই কাটিয়া যায় ও তাহার পরে কেরাণীগিরির জন্য লালায়িত হইয়া সাহেবের চাপরাশীকে অবধি সেলাম করিতে বাধেনা! যে চাকরী পাইলে নিজেকে স্বর্গের ভাগ্যবান জীব বলিয়া মনে করে, তাহাকে বিশ্বমানবতার কথা বলা তামাসা করা ছাড়া আর কি!

বেবী শুনিতে শুনিতে গদগদ হইয়া বলিল, "আহা, কী চমৎকারই না বলচেন!"

কুমারকান্তি বিজয়ার দিকে ফিরিয়া বলিল, "আর আপনার কেমন লাগচে?"

"আমার? আমি বুঝতে পারচিনে।"

কুমার বলিল, "আপনি ঠিকই বলেচেন। আমরা এ ভাষা বুঝতে পারিনে। দেশের যেখানে মূল গ্রন্থি, যেখানে তার আসল বেদনা-বোধ সেখান থেকে আমাদের গ্রন্থি বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। তাই আমরা মুষ্টিমেয় বড়লোকের দল নিজেদের স্ফীতকায় অজ্ঞান আর অক্ষমতা নিয়ে একপাশে দিন কাটাচ্চি।"

বিজয়া আর কিছু বলিতে পারিলনা। কিন্তু তাহার মনের মধ্যে দু-একটা টুক্‌রা টুক্‌রা ছবি বিদ্যুতের মত ঝলসিয়া উঠিতে

লাগিল। সত্যই সে কি বুঝিতে পারেনা? তার স্বামীগৃহে দু'একটি দিনের কথা মনে পড়িল। যেদিন সরজিৎ অভুক্ত অন্ন পাতে ফেলিয়া রাখিয়া শুষ্কমুখে টাকার চেষ্টায় বাহির হইয়া গিয়াছিল, কুড়িটাকা মাহিনা ছাত্রের বাড়ীতে চাহিতে গিয়া কত কঠিন কথাই না শুনিয়াছিল। তার মুখের সেই দৃঢ়তা-ব্যঞ্জক কঠিন রেখা মনে পড়িল, "এই চল্লিশ টাকাতেই যেমন করে হোক আর কয়েকটা মাস আমাকে চালিয়ে নিতেই হবে বিজয়া!" কী অতলস্পর্শ অন্ধকার! আমাদের দেশে সরজিতের মত প্রতিভাবান-ছাত্রই বা ক'টা আছে! বিজয়া ভাবিতে লাগিল, কিন্তু তা'দের অধিকাংশের ভাগ্য তা'দের সমস্ত চেষ্টার আশাহীন উদ্যম কী অন্ধকারের মধ্যেই না বিলীন হইয়া যায়! ক'জন সে অন্ধকার ঠেলিয়া আলোর দিকে মুখ তুলিতে পারে? একটা দেশের, একটা জাতির শ্রেষ্ঠতম-অংশ দেশের যুবকদের এই মিলিত ব্যর্থতা এবং নিঃশ্বাস, এইটেই হয়তো স্বদেশী আন্দোলনকে কিছুতেই নিভিতে দিতেছেনা—বহ্নি ভিতরে ভিতরে আর বাধা মানিতেছেনা।

সভা শেষ হইয়া গেলে ভীড় ঠেলিয়া আসিতে আসিতে একটি পরিচিতা মেয়েকে দেখিতে পাইয়া বিজয়া তাহার সঙ্গে কথা বলিবার জন্য তাহার কাছে গেল।

"বনলতা যে, চিনতে পারচনা?"

একটি সাদাসিধে দেশীকাপড়-পরা মেয়ে মুখ তুলিয়া বিজয়াকে

দেখিতে পাইয়া আনন্দ প্রকাশ করিয়া কহিল, "ওমা, বিজয়া যে, চিনতে পারবনা কি রকম !"

তারপরে দু'জনে মিনিট-পাঁচেক কথাবার্ত্তা হইল। বনলতা যখন ফার্ষ্ট-ইয়ারে পড়িত তখনই তাহার বিবাহ হইয়া যায়। সে ও বিজয়া এক কলেজে একই ক্লাসের সহধ্যায়িণী ছিল।

বনলতা বলিতেছিল, "যাই বল ভাই, এমন চমৎকার লাগ্‌ল আজকের বক্তৃতা শুনতে। মনে হচ্চে যেন আজ দিনটি সার্থক কাট্‌ল। কোথাও বাইরে যেতে পাইনে, সংসারের কাজে দিন যে কেমন করে কেটে যায় ঠাহর পাইনে। আজ ঠাকুরপো কিছুতেই ছাড়লেনা, জোর করে নিয়ে এ'ল। তোমার তো ভাই অগাধ অবসর। একদিন সময়মত এসো কিন্তু বেড়াতে, আমাদের এই ঠিকানা তোমাকে বলে দিচ্ছি।"

লোকের ভীড়ে আর কথা বলিবার অবসর হইলনা। বিজয়া, কুমারকান্তি ও বেবীর পিছনে পিছনে গাড়ীতে আসিয়া উঠিল।

*

* *

পরের দিন :—

বিকালের দিকে বনলতাদের বাড়ী যাইবে বলিয়া সে ড্রাইভারকে গাড়ী আনিতে বলিল। অনেকদিন পরে তাহার

সঙ্গে কাল দেখা হইয়া যাওয়ায় তাহার খুব ভালো লাগিয়াছিল, পুরাতনদিনের অনেক কথা মনে পড়িয়া যাইতেছিল। ঐ বনলতাদের সাহচর্য্যে যখন তাহার দিনগুলি কাটিয়া যাইত তখন কি সুন্দর কি অনাবিল আনন্দে ভরাই-না ছিল সময়টা। সরজিতের সঙ্গে তখন তার প্রথম আলাপ হইতেছে—তাহার অদ্ভুত সরলতা, জ্বলন্ত প্রতিভা কেমন করিয়া ধীরে ধীরে বিজয়াকে আকর্ষণ করিয়া লইতেছিল সে-সমস্তই নানাভাবে ঘুরিয়া-ফিরিয়া তার মনে হইতেছিল। শুনিয়াছিল, পোষ্টাফিসে ডাকবিভাগে বনলতার স্বামী কি একটা চাকুরি করে, ঠিকানাটা মনেই ছিল, সেই ঠিকানায় গাড়ী লইয়া যাইতে বলিল। যখন পৌঁছিল বনলতাদের বাড়ীতে, তখন সে একটা হাতুড়ি দিয়া ছোট ছোট করিয়া কয়লা ভাঙ্গিতেছিল উনানে আঁচ দিবে বলিয়া।

বিজয়াকে দেখিয়া সপ্রতিভভাবেই অভ্যর্থনা করিল। হাসিয়া বলিল, "তুমি আসবে এ আমি জানতেম, তবে এত শীগ্‌গীর আসবে এটা অবশ্য আশা করতে পারিনি।"

বিজয়াকে বাহিরের একমাত্র সজ্জিত ঘরটীতে বসাইয়া সে কাজ সারিয়া আসিতে গেল। একলা চুপ করিয়া বসিয়া ঘরখানির চারিদিকে সে কৌতূহলী-দৃষ্টিতে চাহিতে লাগিল। ঘরের দেয়ালে কয়েকখানি ছবি। মাছের আঁশ দিয়া তৈরী-করা ফুলের সাজি, ঝিনুক-বসানো কারুকার্য্য, তুলা ও পশমের তৈরী হ্রদের মধ্যে হাঁস সাঁতার কাটিতেছে। কয়েকটি হাতে-আঁকা ছবি ও সূতার

তৈরী এমব্রয়ডারি, একপাশে একটি ছোট ডোয়ার্কিনের বাজনা, তার উপরে একটি পুরাতন কাপড়ের পাড় দিয়া তৈরী ঢাক্‌না। চেয়ার-গুটিকতক সাজানো একটি টেবিলকে ঘিরিয়া। টেবিলের উপরকার আচ্ছাদনেও বহুযত্নে-তোলা সূক্ষ্ম সূচিকার্য্য। চেয়ারগুলিতে এমব্রয়ডারি-করা কুশন ও ঢাক্‌না দেওয়া। অল্পক্ষণপরে বনলতা ঘরে ঢুকিল। তাহার হাতে এক-পেয়ালা চা ও একটী প্লেটে কিছু খাদ্যদ্রব্য।

বিজয়া বলিল, "তুমি নিজের জন্যে আর এক-পেয়ালা চা নিয়ে এস, আর এত খাবার আমি খেতে পারবনা, আমার সঙ্গে একসঙ্গে কিছু খাও। মনে নেই, কলেজে আমরা একসঙ্গে কত খেয়েচি ?"

বনলতা কোন কথা না বলিয়া একটু হাসিল। বিজয়া আরও জেদ করাতে অবশেষে একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "মাপ কর ভাই, আমি একটু পরেই খাব। উনি এখনও অফিসের কাজ থেকে ফেরেননি, আর একঘণ্টা পরে সওয়া-পাঁচটায় ফিরবেন........"

বিজয়া আর অনুরোধ না করিয়া হাসিয়া নিরস্ত হইল। কিন্তু হঠাৎ তাহার কি জানি মনে পড়িয়া গেল, সরজিৎ নিজে কুকারে রাঁধিয়া খাইত, তখন সে কিন্তু বাপের বাড়ীতে আয়া, বাবুর্চ্চি, ভৃত্যের দ্বারা সেবিত হইয়া বেশ আরামেই ছিল, কোথাও বাধে নাই।

দুই বন্ধুতে সুখ দুঃখের অনেক কথা হইল। বনলতা বলিতেছিল, "উনি দেড়শো করে মাইনে পান। ঐ শুনতেই দেড়শো, কলকাতা-সহরে দেড়শো টাকায় যে কি করে সংসার চালাতে হয়, সে কি ভাই তোমরা কল্পনাতেও আনতে পারবে? নিজে সমস্তই করি, কেবল একটা ব্যাপারে মনটা ভেঙ্গে গেছে। আমার একটি-ই দেওর, সে খুব ভালো করে এম-এ পাশ করেচে, কিন্তু আজ তিনবছর বাড়ীতে বসে রয়েচে, কোথাও একটু চাক্‌রি-বাক্‌রির সুবিধা করতে পারলেনা। সে বেচারা একেবারে মুস্‌ড়ে পড়েচে, কোন কিছুতেই আর উৎসাহ নেই। এম-এ পাশ করেই বিয়ে করেছিল, বৌ এতদিন বেশির ভাগ বাপের বাড়ীতে থাকত, অরে বেশিদিন ধরে বাপের বাড়ীতে ফেলে রাখা ভালো দেখায়না। ভাবচি এইবারে নিয়ে আসব।"

বনলতার স্বামীর ফিরিবার সময় হইয়াছে, হয়তো তাহার এখনও অনেক কাজই বাকী মনে করিয়া বিজয়া বিদায় লইয়া উঠিল।

রাত্রিতে বিজয়া স্বপ্ন দেখিল, তার স্বামীর সঙ্গে সে কথা বালতেছে। কেমন করিয়া দেখা হইল, কোথায়, এসব তার স্মরণে নাই। সরজিৎ হাসি হাসি মুখে বলিতেছে,......"বিজয়া, তুমিই শেষকালে হেরে গেলে। মনে নেই তোমার? আমার সঙ্গে বিয়ের আগে তোমার বাবার লাইব্রেরী-ঘরে একদিন তাঁর একটি পুরোণ ডায়েরী খুঁজে পেয়েছিলে, সেই খাতার পাতা থেকে তাঁর জীবনের

গল্পটি আবিষ্কার করে আমাকে আদ্যোপান্ত শুনিয়েছিলে, মনে নেই তোমার, বিজয়া ? তিনি, তোমার বাবা, প্রেমে পড়ে বিয়ে করেছিলেন একটি ধনীর কন্যাকে। দু'জনে মিলে কত আদর্শ-রচা, কত স্বপ্নের উন্মেষের মধ্য দিয়েই-না আরম্ভ করেছিলেন জীবন। কিন্তু যে মুহূর্তে মেয়েটিকে কল্পনার ভাঙ্গা-গড়া ছেড়ে বাস্তব-জগতে নেমে আসতে হ'লো, আরামদায়ক প্রাসাদতুল্য বাড়ী ত্যাগ করে একতলা স্যাঁৎসেঁতে ঘরে বাস করতে সুরু করতে হ'লো, সেই থেকেই তার স্বপ্ন ছুটে গেল। তার বদলে প্রবল অনুশোচনায় মন তিক্ত হয়ে উঠল। তোমার বাবা এই ব্যর্থতা, জীবনের পানপাত্র ভরে পান করেছিলেন, হয়তো মনে মনে আশা করেছিলেন, তাঁর জীবনে যা ব্যর্থ হ'লো, একদা তাঁর প্রিয়তমা কন্যার জীবনে তা সফল এবং বিকশিত হয়ে উঠবে। কিন্তু তা হ'লোনা। শেষে তুমিও ...."

বিজয়ার ঘুম ভাঙ্গিয়া যাওয়ার পরেও স্বপ্নের এই মধুর করুণ-রেশ তাহার মনে বহুক্ষণঅবধি বাজিতে লাগিল। সরজিতের প্রেম তাহার মনের যেসব অভ্যাস এবং সংস্কার দূর করিতে পারে নাই, এখন তাহার দীর্ঘ অদর্শন এবং তাহার প্রতি একটা প্রবল গভীর অভিমানের বন্যাস্রোতে তাহার মনের আমূল-সংস্কার সমস্তই একটার পর একটা ভাসিয়া যাইতে লাগিল।

*

* *

সকালবেলায় আয়া বিজয়ার কাপড় জামা এবং চটিজুতা লইয়া অপেক্ষা করিতেছিল। স্নানের ঘরে গরমজল এবং মুখ হাত প্রক্ষালন করিবার সর্ব্ববিধ বস্তু সাজাইয়া রাখিয়াছে।

আজ সকালে ঘুম ভাঙ্গিয়া উঠিয়াই গতরাত্রির স্বপ্নের কথা বিজয়ার মনে পড়িয়া গেল। নবজীবনের প্রথম আলোক দর্শনের মত আজিকার সকালবেলার তরুণ-সূর্য্যালোকে তাহার মনের মধ্যে একটি নূতন সুর বাজিতে লাগিল। সে-সুর প্রেমাস্পদের প্রতি প্রেমে, আত্মসমর্পণে, অভিমানে অনির্ব্বচনীয়।

মনে মনে সে নিজের কর্ত্তব্য অনেকটা ঠিক করিয়া লইল। আজ হইতে সে নিজের জীবনের ষ্টাইল সম্পূর্ণভাবে বিস্মৃত হইবে। এই তো সেদিন সখী বনলতার বাড়ীতে যাইয়া দেখিয়া আসিল, অশনে, বসনে, গৃহসজ্জায় সর্ব্বত্র তাহার সেবানম্র হাত দুইখানি কেমন করিয়া ব্যাপৃত হইয়া আছে। সেই পাইয়াছে তাহার স্বামীকে সর্ব্বতোভাবে সকল দিক দিয়া। কোনখানে কোন আড়াল, কোন দূরত্ব নাই। তাঁর গৃহ সে নিজের হাতের কারুশিল্প দিয়া সাজাইয়াছে, তাঁর আহার্য্য নিজের হাতে প্রস্তুত করে, তাঁর অবসরসময়ে চিত্তবিনোদন করে। আর যাই হোক সে

পরাশ্রিতা (parasite) নয়। তার স্বামীও সংসার চালাইবার জন্য—স্ত্রী, ছেলেমেয়েদের সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে রাখিবার জন্য বাহিরে যেমন অবিশ্রান্ত খাটিতেন, বনলতাও সংসার বজায় রাখিয়া সুশৃঙ্খলে সুন্দর করিয়া চালাইবার জন্য ভিতরে তাহার চেয়ে বেশি পরিশ্রম করিত।

আর সে ?……তাহার চিন্তাস্রোতে বাধা পড়িল। আয়া আসিয়া বলিল, "দিদিমণি, আপনার মুখ হাত ধোবার জল অনেকক্ষণ দিয়েচি, ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে। এই যে চটিজুতো নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েচি, পায়ে দিন, উঠে মুখে হাতে জল দিন। আজ কি আপনার শরীরটা ভালো নেই ? অনেকক্ষণ উঠেচেন, দেখচি বিছানাতেই চুপ করে বসে আছেন।"

বিজয়ার হঠাৎ অত্যন্ত বিরক্তি লাগিল। এই সকাল হইতে উঠিয়াই পরিচর্য্যার পালা সুরু হইল। একজন চটিজুতা লইয়া ঠায় দাঁড়াইয়া থাকিবে, মুখ ধুইবার সময় হাতে হাতে তোয়ালে গরমজল জোগাইবে—সমস্ত চিন্তা ঝাড়িয়া ফেলিয়া সে একেবারে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "আমি সব নিজেই ঠিক করে নিচ্চি। তুমি চটিজোড়াটা ঐখানে রেখে ড্রাইভারকে বলে এস, একবার গাড়ীখানা বা'র করবে। আমি এখনই চা খেয়ে এক-জায়গায় বেরুব।"

বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া সে ড্রাইভারকে শৈলজার বাড়ী লইয়া যাইতে বলিল। শৈলজা তখন ভারি ব্যস্ত ছিল। ঘড়িতে ন'টা

বাজিয়াছে, এখনই স্বামী অফিস যাইতে চাহিবেন, ছেলেদের স্কুলের তাড়া আছে। ভাত ডাল ও একটা তরকারী নামাইয়া রাখিয়া সে মাছ ভাজিতেছিল। বিজয়াকে দেখিয়া কড়া নামাইয়া রান্নাঘরের প্রাঙ্গণেই একখানা আসন অগ্রসর করিয়া দিয়া বলিল, "কিগো, কি মনে করে? হঠাৎ পথ ভুলে নাকি?"

বিজয়া বলিল, "না, আর ব'সবোনা ভাই। আমাদের বাড়ীর চাবিটা উনি তোমাদের কাছেই রেখে গেছেন, চাবিটা একবার দাও। ঘর দোরগুলো দেখে-শুনে পরিষ্কার করিয়ে আসি।"

"চাবিটা ভাই কর্ত্তার কাছে আছে, দু'মিনিট সবুর কর, এখনই নিয়ে এসে দিই। সরজিৎবাবু ওঁকে লিখেচেন, ও-মাস থেকে বাড়ীটা ভাড়া দিয়ে দেবার বন্দোবস্ত করে দিতে, তার আগে তোমার কাছে খবর পাঠাতে, তোমার যা কিছু দামী জিনিষপত্র রয়েচে নিয়ে যাবে। ভালোই হ'লো যে তুমি নিজেই এ'লে, নইলে কাল পরশুর মধ্যে আমি তোমার কাছে একটা লোক পাঠাতেম। কি আছে সব ভাই দেখে শুনে নাও, জানোই তো তোমার কর্ত্তাটির হুঁশ! যাবার সময় জিনিষপত্র সব তেমনই অ-গোছালো করে রেখে গেছেন, আমি আবার আমার চাকরটাকে রাত্রিতে তোমাদের ওখানে শুতে পাঠাই। খালি-বাড়ী ফেলে রাখতে কেমন সাহস হয়না।"

বিজয়া বলিল, "তুমি চাবিটা এনে দাও। ওঁর যেমন অনাসৃষ্টি কথা, আমার শ্বশুরের ভিটে উনি ভাড়া দেবেন কেন?

আমি যেয়ে দেখে আসি, সমস্ত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়ে আসি..... ”

শৈলজা গম্ভীরভাবে বলিল, “তা ভাই যাই ব’লো, তোমার বাড়ী যেমন পোড়ো-বাড়ীর মত পড়ে আছে, সন্ধ্যে পড়েনা, ঝাঁট পড়েনা, তার চেয়ে কোন ভদ্র-পরিবারকে ভাড়া দিয়ে দেওয়াই ভালো। আগেকার দিনের সেকেলে-গিন্নীদের এমন ছিল—একবার ক’লকাতায় খুব বসন্ত হয়, তখন আমার শ্বাশুড়ি-ঠাক্‌রুণ বেঁচে, সবাই মিলে ক’লকাতা ছেড়ে পালাবার প্রস্তাব হ’লো ; উনি বললেন, তা হয়না, আমি যেতে পারবনা। তোরা ছোট ছোট ছেলেপুলে নিয়ে সরে যা, আমি থাকি। এ আমার শ্বশুরের ভিটে, এখানে সন্ধ্যে পড়বেনা তা কেমন করে হবে।—এই যে, চাবিটা চেয়ে এনে দিই ভাই, একটু দাঁড়াও।”

বিজয়া চাবি খুলিয়া অনেকদিন পরে সরজিতের পরিত্যক্ত বাড়ীতে প্রবেশ করিল। চারিদিকে তাহার চিহ্ন তাহার স্মৃতি ছড়ানো।

একটা দেরাজে তার নিজের জামা কাপড় ছিল সেটা খুলিয়া দেখিল, তার সেই যে হীরার বালা-জোড়াটা একদিন বল্লভ স্যাক্‌রাকে বিক্রয় করিতে গিয়াছিল সে-জোড়া একটা ভেলভেটের বাক্সে আছে।

ঘুরিতে ঘুরিতে তাহার স্বামীর পড়ার ঘরে ঢুকিল, এইখানে সরজিৎ কত রাত্রি জাগিয়া পড়িয়াছে। একটা চায়ের পেয়ালা

অধৌত হইয়া পাশের ছোট টিপায়ের উপর কে-জানে কতদিন হইতে পড়িয়া আছে। একটা রাইটিংপ্যাড আছে। চেয়ারে ধীরে ধীরে বসিয়া পড়িয়া বিজয়া সেইটি খুলিয়া বসিল। আগে স্বামীর উপর অভিমান করিয়া সে এ-ঘরে কখনই আসিতনা।

রাইটিংপ্যাডে তাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া লেখা অনেক চিঠি। তারিখ দেখিয়া বুঝিল, সে যখন এখানে ছিল তখনও তাহাকেই মনে করিয়া সরজিৎ কত চিঠি লিখিয়াছে, অথচ সেসব চিঠি বিজয়া কোনদিন পড়ে নাই। যে লিখিয়াছে তাহারও পড়িতে দিবার উদ্দেশ্য ছিলনা। একটি চিঠি পড়িতে পড়িতে সে তন্ময় হইয়া গেল, সরজিৎ লিখিতেছে—

"বিজয়া, তুমি নিজে বুঝতে পারনা, কিন্তু আমি বেশ বুঝতে পারি তোমার মধ্যে দু'টো স্পষ্ট আলাদা ব্যক্তিত্ব রয়েচে। একটি হচ্চে চিরন্তন তুমি, সেই-তোমাকেই আমি মনে মনে বরণ করে নিয়েচি। সেই-তোমার মনে আদর্শবাদের স্নিগ্ধ মেদুর ছায়া, চোখে উদার কল্পনার অঞ্জন। আর একটি-তুমি দশজনের চাপে গড়ে উঠেচ, তোমাদের সমাজের ষ্টাইল, তোমার এতদিন-কার বিলাসিতাপূর্ণ কৃত্রিম হাওয়ার আবেষ্টনে সে পুষ্ট হয়েচে। এই কৃত্রিম-বিজয়ার প্রকাশটাই ক্ষণে ক্ষণে আমাকে চমকিয়ে দেয়, ব্যথিত করে। কিন্তু আমি জানি একে পার হয়ে যেয়েও এক জায়গায় সত্যকার-তুমি আছ।......"

বিজয়া চিঠির প্যাডখানি পাঠান্তে সযত্নে বন্ধ করিয়া রাখিল,

আঁচল দিয়া লিখিবার টেবিলের ধূলা বালি মুছিয়া লইল, অন্য-মনস্ক হইয়া আকাশের দিকে তাকাইয়া থাকিতে থাকিতে কি একটা দুঃসাধ্য-সঙ্কল্পের আভা তাহার মুখে দীপ্যমান হইয়া উঠিল।

দেরাজ খুলিয়া হীরার বালা-জোড়াটি আঁচলে বাঁধিয়া লইয়া সে বাড়ীর বাহিরে আসিল, আর সমস্ত জিনিষপত্র যেমনকার ছিল তেমনই থাকিল। দ্বারে তালাবন্ধ করিয়া এবারে আর সে চাবি শৈলজাকে ফিরাইয়া দিতে গেলনা, নিজের আঁচলেই বাঁধিয়া ফেলিল।

*

* *

বাড়ীতে আসিয়া কুমারকান্তিকে একখানা চিঠি লিখিয়া পাঠাইয়া দিল, বিশেষ প্রয়োজন আছে, সে যেন বিকালের দিকে একবার আসিয়া বিজয়ার সঙ্গে নিশ্চয় দেখা করে।

আয়া বিজয়ার মাথার চুল খুলিয়া আঁচড়াইয়া দিবে বলিয়া অপেক্ষা করিতেছিল। তার হাতে চিরুনি, হেয়ার-লোশন্, নানা সরঞ্জাম।

বিজয়া তাহার দিকে চাহিয়া মৃদু হাসিয়া বলিল, "আচ্ছা আয়া, এসব কাজ না করে তোমাকে যদি অন্য কাজ করতে হয়,

এই যেমন ধর, সকাল-থেকে আমার চটিজুতো হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা, মাথা আঁচ্ড়িয়ে দেওয়া এসমস্ত কাজের বদলে বাটনা বাটতে হয়, উনুনে আগুন দিতে হয়, তা পারবে ?”

আয়া বিজয়াকে ছোট-বেলা হইতে মানুষ করিয়াছিল, অত্যন্ত স্নেহশীলা-প্রকৃতির। সে বলিল, “কেন পারবোনা দিদিমণি ? আমার বাড়ীতে আমি নিজে রেঁধে খেতুমনা এতদিন ? মশলাও বাটতে হ’তো, উনুনে আঁচও দিতে হ’তো। তুমি ডাকলে বলেই এ’লাম। নইলে তুমি শ্বশুরবাড়ী চলে যাবার পরে আর আমি কোথাও চাকরি করিনি, বাড়ীতেই ছিলাম। তা, হ্যাঁ দিদিমণি, এসব কথা জিজ্ঞেস করচ কেন ? তুমি আবার কোথাও যাবে নাকি ? জামাইবাবু আর কতদিন পরে ফিরবেন ?”

বিজয়া বলিল, “তাঁর ফেরবার এখনও দেরী আছে, কিন্তু আবার আমি মনে করেচি শ্বশুরবাড়ীতে যেয়েই থাকব। তিন চারদিনের মধ্যেই হয়তো যাব। তুমি যাবে আমার সঙ্গে ?”

“নিশ্চয় যাব। তুমি আমাকে সঙ্গে নিয়ে যেখানে যাবে সেখানেই যাব। কিন্তু দিদিমা’র মনে দুঃখ হবেনা ?”

“বিয়ের পরে মেয়ে শ্বশুরবাড়ী গেলে কি মায়ের মনে দুঃখ হয়না ? সব মায়েরই হয়। কিন্তু তাঁরা সে দুঃখ সহ্য করেন, ভুলে যান, মেয়েকেও শ্বশুর বাড়ী পাঠান।”

পাঁচটার সময় কুমারকান্তি আসিয়া বলিল, "কি ব্যাপার বিজয়াদি? এত জোর তলব করেছিলেন কেন?"

বিজয়া বাক্স হইতে তার হীরার বালা-জোড়াটি বা'র করিয়া বলিল, "দেখুন, এইটে বিক্রী করে আমাকে টাকা এনে দিতে হবে।"

কুমারকান্তি কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া বলিল, "হঠাৎ আপনার টাকার কি এত প্রয়োজন হ'লো? আমার কাছ থেকে টাকাটা ধার বলেও নিতে পারেননা ভাই? আপনার স্বামী এলে ফিরিয়ে দিতেন।"

বিজয়া দৃঢ়স্বরে বলিল, "না, নিতে পারিনে। কিন্তু আপনি কি এটা বিক্রী করে দিতে পারেননা?"

একটু আহত হইয়া অভিমানক্ষুব্ধকণ্ঠে কুমার বলিল, "এসব যে ভারি দামী জিনিষ। কত এর দাম হবে তা সাধারণ লোকে ব'লবে কেমন করে। আচ্ছা এক কাজ করতে পারি, এটা বন্ধক দিয়ে আপনাকে কিছু টাকা এনে দিতে পারি। কত টাকার আপনার দরকার বলুন।"

বিজয়া মুখে-মুখে কি একটা গুণ করিতে করিতে কহিল, "আচ্ছা, ওঁর যাওয়ার পরে দেখতে দেখতে ছ'মাস হ'য়ে গেল। আর তো ওঁর ফিরতে মোটে দেড়-বছর......তার মানে আঠারো মাস। আচ্ছা, আমি যদি মাসে চল্লিশ টাকার বেশি না খরচ করি তাহলে আঠারোকে চল্লিশ দিয়ে গুণ করলে কত হয়?......"

কুমার হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, "সাতশো কুড়ি হয়। কিন্তু মনে মনে আপনি ভয়ানক একটা কিছু মতলব এঁটেচেন বিজয়াদি, শীগ্‌গীর বলে ফেলুন।"

বিজয়া বলিল, "আপনি তাহলে ঐ বালা-জোড়াটা বাঁধা রেখে হোক বিক্রী করে হোক আমাকে পুরোপুরি আটশো টাকাই দেবেন। মতলব আমার একটা আছে, বলচি, কিন্তু সেটা ভয়ানক কিছু নয়, অত্যন্ত সহজ আর স্বাভাবিক। আমি ঠিক করেচি, এবার থেকে আমার শ্বশুরবাড়ীতে যেয়ে থাকব। মাসে টাকা-চল্লিশেক হ'লেই দিব্যি আমার খরচ চলে যাবে। তারপর উনি তো ফিরেই আসছেন।"

কুমার আশ্চর্য্য হইল, তারপরে সেভাব সংবরণ করিয়া লইয়া বলিল, "মতলব মন্দ নয়। তাহলে সরজিৎবাবুর বাড়ীর পাশাপাশি আমাদের জন্যেও একটা ছোটখাট বাড়ী দেখবেন। একলা থাকবেন নাকি? তা আপনাদের সাহসে কুলোবে। আপনারা হ'লেন একালিনী, নারীপ্রগতিবাদিনী মেয়ে।"

বিজয়া হাসিয়া বলিল, "অমন কথা ব'লবেননা। একালিনী আর সেকালিনী মেয়ের সংজ্ঞা নিয়ে অনেক তর্ক আর বাদ-বিসম্বাদ হয়ে গেছে। ও বস্তু আর নয়। কিন্তু একলা থাকবার বিষয় নিয়ে আপনার অত উৎকণ্ঠিত হবারও প্রয়োজন নেই, আমার দাসী আমার কাছে থাকবে, সে অনেকদিনের পুরোণ; আমাকে একরকম মানুষ করেচে বললেই হয়। আর আমাদের বাড়ীর

গায়ে-লাগাও শক্তিপদবাবু-উকীলের বাসা আছে, আপনি হয়তো চেনেননা, তাঁর স্ত্রী শৈলজা আমার বন্ধু। সে নানারকম ভাবে আমাকে সাহায্য করবে, এখনও করে। তাদের বাড়ীর দারোয়ানকে সে রাত্রিতে ওখানে শুতে পাঠায়। আমার জন্তে আপনাদের কোন ভাবনারই কারণ নেই। তা'ছাড়া সাত-সমুদ্র তেরো নদীর পারে যেয়ে পড়িনি, আপনারা ইচ্ছা হ'লেই মাঝে মাঝে বেড়াতে যাবেন, খোঁজ-খবর নিয়ে আসবেন।"

"আপনার প্ল্যান্ জানতে পারলেই বেবী এখনই জিদ ধরবে আপনার কাছাকাছি একটা বাড়ী দেখতে।"

"ছি ছি, অমন কথা ব'লবেননা। বেবীর অমন রাজ-প্রাসাদের মত স্বামীর বাড়ী থাকতে কিসের জন্তে সে ভাড়াবাড়ী খুঁজে বেড়াবে! আমার স্বামী দরিদ্র, আমার কি সাজে আপনাদের ঐ বালীগঞ্জে ষ্টাইল-করে থাকা!"

"আপনার স্বামী দরিদ্র! বলবেননা অমন কথা, লোকে হাসবে।"

"লোককে তো বলতে যাইনি কুমারবাবু, আপনাকে বলেচি। আপনি তাঁর বন্ধু, তাঁকে জানেন, চেনেন। আজই তিনি আই-সি-এস হয়েচেন, কিন্তু এইটুকু হতে তাঁকে অনেক কিছু স্বীকার করতে হয়েচে, সহ্য করতে হয়েচে। আমার জন্মে কেনই-বা তাঁকে এত সহ্য করতে দিতে পারব, আমি যদি কিছু সহ্য করতে না শিখি? সৌভাগ্যের ঋণ উত্তরোত্তর জমতে দিলে

ভালো হয়না জানেন তো? মাঝে মাঝে তার কিছু শোধ করে দিতে হয়। আপনি বরঞ্চ আমাকে আশীর্ব্বাদ করতে পারেন, আমি যেন যথার্থ ই দরিদ্রের স্ত্রী হতে পারি।”

কুমার মৃদুস্বরে কহিল, “আমি বয়সে আপনার চেয়ে বড় হ’লেও সম্পর্কে ছোট, আশীর্ব্বাদ করবার অধিকার আমার নেই বিজয়াদি, কিন্তু আমি সর্ব্বান্তঃকরণে কামনা করচি, আপনি যথার্থই যেন তাই হতে পারেন।”

*

* *

শরতের নির্ম্মল নীল আকাশে সবেমাত্র একটি তারা উঠিয়াছে। বিজয়া তাহার স্বামীগৃহে তুলসীতলায় দীপ দেখাইয়া প্রণাম করিতেছিল। তাহার উৎসুক চরণ এবং অধীর চিত্ত বারংবার তাহাকে অন্তঃপুরের সীমাপ্রান্ত পার হইয়া বহির্ব্বাটীর দিকে টানিতেছিল। আজ সরজিতের আসিবার দিন। এই সন্ধ্যার ট্রেণে তাহার কলিকাতা পৌঁছিবার কথা। কয়েকমুহূর্ত্ত পরে বাহিরে একটা মোটর দাঁড়াইবার আওয়াজ হইল। পরক্ষণেই কুমারকান্তির পিছনে ধুতি পাঞ্জাবি-পরা গায়ে একটা আলোয়ান-জড়ানো সরজিতের দীর্ঘমূর্ত্তি প্রাঙ্গণে ছায়া ফেলিল।

কতদিন পরে দেখা! বিজয়ার বুকের মধ্যে একটা অধীর চঞ্চলতা কেমন করিয়া উঠিতেছিল, মুখ চোখ ঝাঁ-ঝাঁ করিতেছিল।

কুমারকান্তি ডাকিয়া বলিল, "কোথায় গেলেন বিজয়াদি, রান্নাঘরে নাকি? মাছের ঝোলে কি দিয়েচেন, সুগন্ধে যে গোটা-বাড়ী মাৎ! আগে কিন্তু একটু চায়ের জল চড়ান্। বেবী ঝোঁক ধরেছিল, কতদিন পরে সরজিৎবাবু আসচেন, আজ ওঁকে আমরা ষ্টেশন থেকে ফুলের মালা-টালা পরিয়ে নিয়ে আসব, ধুমধাম করে আমাদের বাড়ীতে ভোজ দেব। আমি বারণ করে বল্লেম, না না, ওসব আজ নয়, অন্যদিন হবে। আজ কেবল একজনের হাতের গাঁথা মালা ওর জন্যে অপেক্ষা করে রয়েচে, আর বিজয়াদির নিজের হাতের রান্না মাছের ঝোল ভাত, তার থেকে ওঁকে আজ বঞ্চিত করলে সেটা ঘোরতর অন্যায় করা হবে।"

বিজয়া নিজেকে সংবরণ করিয়া লইয়া গলায় আঁচল দিয়া বাহিরে আসিয়া স্বামীকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল, তারপর কুমারকান্তিকে মৃদুস্বরে বলিল, "আপনারা এই রান্নাঘরে ধোঁয়া আর ধুলোর মাঝখানে কেন, বসবার ঘরে চলুন। আমি পাঁচমিনিটের মধ্যে চা তৈরী করে নিয়ে যাচ্ছি।"

সরজিৎ সতৃষ্ণ নয়নে রান্নাঘরের দিকে একবার চাহিয়া বলিল, "কেন, এখানেই বা মন্দ কি, কি বলহে? তোমার কোন আপত্তি আছে নাকি?"

কুমার হাসিয়া বলিল, "বিন্দুমাত্র না। যে পাঁচমিনিটে চা তৈরী হবে সেই পাঁচমিনিটই বা তোমার নষ্ট হয় কেন! আমি কি আর এটুকু বুঝিনা, এতই অকৃতজ্ঞ!"

বিজয়া হাসিয়া সুপরিষ্কৃত অঙ্গনে দুইখানি আসন পাতিয়া দিতে দিতে বলিল, "আপনি বিধিমত অকৃতজ্ঞ! বিজয়াদি বলে ডাকেন, আবার গুরুজনকে নিয়ে ঠাট্টা-তামাসা করতেও বাধেনা!"

চা খাইয়া কুমারকান্তি বিদায় লইয়া গেলে সরজিৎ পকেট হইতে একটি ভেলভেটের বাক্স বাহির করিল। স্প্রিংয়ের ডালাটা খুলিয়া একজোড়া হীরার বালা বাহির করিয়া বিজয়ার হাত দুইখানি নিজের হাতে লইয়া পরাইয়া দিতে দিতে বলিল, "এটা কোন্ বালা, চিনতে পারো বিজয়া? কিন্তু এদিকে তোমাকে যথাযোগ্য ষ্টাইলে রাখতে পারব বলে আমি আকাশ পাতাল ঘুরে এলেম—এসে দেখি তুমি সমস্ত ষ্টাইল ভুলে বসে আছ।"

শেষ